গিরীন চক্রবর্ত্তী

সোনার দেশ সোভিয়েট

:: পূরবী পাবলিশার্স ::
৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

প্রথম মুদ্রন—জানুয়ারী ১৯৪৬।

মূল্য দুই টাকা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত।
কিশোরী মোহন নন্দী কর্ত্তৃক ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন,
গুপ্তপ্রেশ হইতে মুদ্রিত।

রানীকে—

সূচীপত্র



পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন

সোভিয়েট দেশ

সোভিয়েট দেশ! সে কি যেমন তেমন দেশ। শেষ নেই যেন তার। ম্যাপ খুলে চট্‌করে বুঝতেই পারবে না এর পরিমাপ। তবু একবার খোলোই না ম্যাপ— ইওরোপ থেকে আরম্ভ করে একটানা এশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়লে—তবেই তুমি সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের সীমানা ছাড়াতে পারবে তার আগে নয়! ভারতবর্ষের মত দেশ প্রায় তিনটি পরপর জোড়া দিলে তবে হতে পারে সোভিয়েট দেশের সমান। কেনই বা হবে না? সমস্ত পৃথিবীর মনে কর ছয় ভাগের এক ভাগের সমান হচ্ছে এই সোভিয়েট দেশ!

আমাদের ভারতের সবচেয়ে পশ্চিমের বড় শহর করাচীতে যখন বেলা বারোটা তখন সবচেয়ে পূবের চট্টগ্রামে বাজবে মাত্র বেলা দুটো! আর সোভিয়েটে? তাদের সবচেয়ে পশ্চিমে হচ্ছে লেনিনগ্রাদ আর পূবে ভ্লাদিভস্টক! লেনিনগ্রাদে যখন বেলা বারোটা—তখন ভ্লাদিভস্টকে

বাজবে রাত্তির দশটা! হয়তো তোমরা তখন রাতের খাওয়া সেরে নাক ডেকে ঘুমচ্ছ। ভ্লাদিভস্টক থেকে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে যদি লেনিনগ্রাদে আসতে চাও তো বেশ বড় এক পুট্‌লি খাবারের চ্যাঙারী নিও সঙ্গে। সে তোমার কলকাতা বর্দ্ধমান যাওয়া নয়। এক নাগাড়ে প্রায় দশ দিন চললে তবেই অবশেষে পৌঁছিতে পারবে লেনিনগ্রাদে।

আজকে যাকে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র বলে তারই আগের নাম ছিল রাশিয়া। আর সে ছিল জারের সাম্রাজ্য। তার বুক জুড়ে রয়েছে বন আর জঙ্গল। পাইন, বার্চ্চ আর ওক গাছের ছড়াছড়ি। ট্রেনে যেতে যেতে দুধারে দেখবে মাঠের পর মাঠ—শস্য শ্যামল! হাওয়ায় দোল খাচ্ছে তাদের শীষ; পাইনের ঝাড়ে বাধা পেয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে কে জানে। জঙ্গলের দেশ যেমন, তেমনি জঙ্গল দিয়ে উপকারও কম হয় না এদেশের লোকের। জঙ্গল না হলে যেন চলে না। জঙ্গলের কাঠ কেটে জাহাজ বোঝাই হয়ে রপ্তানী হয় দেশ দেশান্তরে। তাই দিয়ে তৈরী হয় নৌকা, জাহাজ কত কি! হাতের কাছে সস্তায় কাঠ পেতে কেন লোক টিন বা ইটের দালান করবে। গ্রামে গ্রামে দেখবে কাঠের বাড়ীর সার। পুরনো বড় বড় শহরেও কাঠের বাড়ী যে নেই তা নয়।

তোমাদের কে কে দার্জ্জিলিঙ গিয়েছো? যাবার পথে



এই তো সোভিয়েট দেশ---বরফে ঢাকা সদায় সাদা---আর 'স্কী' খেলায় মেয়েদের হুল্লোড়ের শেষ নেই যেন।

শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবি মায়াকোভস্কী





আলেক্সী টলস্টয়

জলপাইগুড়ি থেকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো ঘর বাড়ীর রূপ বদলাচ্ছে। ওপরে টিনের ছাদ রয়েছে বটে তবে ইটের গাঁথুনী বিশেষ নজরে পড়বে না। শিলিগুড়ী থেকে তো খালি দেখবে কাঠের বাড়ী—একতলা, দোতলা সব।

একদিকে বনজঙ্গল আর একদিকে নদনদী! এঁকে বেকে কত নদী যে রাশিয়ার বুকের ওপর দিয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে কে তার হিসেব রাখে। এসব নদ নদীই তো রাশিয়ার গর্ব্ব! তারা যেন জলের পোকা। ইওরোপের অন্য সব দেশের চেয়ে রাশিয়ার লোক জল ভালবাসে বেশী! কারুর বাড়ীর পাশে নদী থাকলে আর তাদের বাড়ীতে মুখ হাত ধোবার বন্দোবস্ত পাবে না! সবাই ছুটবে নদীতে!

যে দেশে যত বেশী নদনদী থাকে সে দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার সুবিধে তত বেশী। জঙ্গল ঘেরা বনাঞ্চল ডিঙিয়ে অন্য দেশে যাওয়া বড় কঠিন। কত রকমের হিংস্র পশু-পাখী থাকতে পারে সে সব গহন বনে। নদীর বুকে অত শত ভয় নেই। রাশিয়াতেও তাই সবাই নদীতে নৌকা করে দেশ বিদেশে যাতায়াত করত। ম্যাপ খুললে দেখতে পাবে সে-দেশের সব বিখ্যাত নদী—ভল্গা, ডন, নিপার, আমুর, লেনা। এদের বুকের ওপর দিয়ে নৌকা করে রাশিয়ার হেন দেশ নেই যেখানে যেতে পারবে না। শীতের দিনেও তাই বলে বোকার মত নৌকা ঠেলে নদীতে নামতে যেও না কিন্তু। তখন দেখবে সব জল জমে নিটোল বরফ হয়ে রয়েছে। নৌকার আর

দরকারই করবে না—পায়ে হেঁটেই বড় বড় নদী পার হতে পারবে। কিছু আটকাবে না। সেই জমজমাট বরফের ওপর দিয়ে শ্লেজ গাড়ী চলে কাতারে কাতারে।

উত্তরে সুমেরু অবধি রাশিয়ার সীমানা। সেখানে শুধু বরফের রাজত্ব। শীতের তো কথাই নেই। পৃথিবীশুদ্ধ লোক রাশিয়ার শীতের ভয়ে কেঁপে অস্থির।

রাশিয়ার যে অংশ সুমেরু সীমান্তে সেখানে শীতের ক'মাস সূর্য্যের মুখই দেখা যায় না। অল্প যে কদিন সূর্য্যের মুখ দেখা যায় তখন আবার সূর্য্য ডুবতে দেখবে না। মাঝ রাত্তিরেও হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে চমকে দেখবে জানালা দিয়ে সোনার কলসীর মত জ্বলছে সূর্য্য! যেদিকে তাকাবে দেখবে বরফ আর বরফ। গাছপালা কিছু নেই। ছোট্ট ছোট্ট ঘাসের মত শুধু একরকমের গুল্ম লতা দেখতে পাওয়া যায় ওদেশে। সেই বরফের মধ্যে আর কে থাকবে বল? ল্যাপ জাতির লোক কষ্টেসৃষ্টে কোনও রকমে দিন কাটায়। এদের হাবভাব চলন সবই একটু আলাদা ধরনের। আর তাতো হবেই। গোলগাল বেঁটে চেহারা, মুখগুলো সব চ্যাপ্টা। সাধারণ তুলো কি পশমের জামায় তাদের শীত কাটানো অসম্ভব। তারা ব্যবহার করে বল্গা হরিণের চামড়ার জামা। মরুভূমিতে যেমন উট না হলে চলে না—এদেরও তেমন চাই বল্গা হরিণ। বল্গা হরিণ পালন করে তার দুধ আর মাংস খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। সুন্দর সুন্দর ছোট তাঁবুতে দল বেঁধে এদের বাস। ইয়া জোয়ান

লোমওয়ালা কুকুরগুলো সারারাত জেগে সে সব তাঁবু পাহারা দেয়। ল্যাপ ছাড়াও সেই সুমেরুতে অন্য দুচারটে জাতির লোক যে বাস করে না তা নয়। ল্যাপ আছে, সামোয়েদ (Samoyed) আছে—আরও কয়েকটি জাতি রয়েছে সাইবেরিয়ার উত্তর অঞ্চলে। মোটেই ভুলো না সমস্ত রাশিয়ায় প্রায় দুশো ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক বাস করে।

এই যে এতবড় একটা দেশ—এর কিন্তু লোকসংখ্যা তত বেশী নয়! পৃথিবীর প্রত্যেক পাঁচজনের মধ্যে তোমরা একজন করে পাবে ভারতবাসী। আর রাশিয়ায় থাকে মাত্র ভারতের অর্দ্ধেক লোক।

যেমন সে দেশে নানা জাতের লোক বাস করে তেমনি তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ এক জীবনে সে সব ভাষা শিখে উঠতে পারবে না। এত সব ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রধান ভাষা হচ্ছে "রুশ"। যারা 'রুশ' ভাষায় কথা বলে তাদের নাম থেকেই দেশের নাম হয়েছিল 'রাশিয়া'। এরা সব শ্লাভ গোষ্ঠীর ও তাদের ভাষার অক্ষর ইওরোপের অন্যদেশের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। গ্রীক ভাষা থেকে রুশ ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু গ্রীক জানলেই তা'বলে রুশ ভাষা বুঝতে পারবে না। তাদের আবার অনেক নতুন নতুন শব্দ আছে কি না। জারের যুগে 'রুশ' ভাষাই চলতো সমস্ত দেশে।

আগেই শুনেছো যে রাশিয়ার উত্তরে রয়েছে বরফের রাজত্ব তুন্দ্রার দেশ! কিন্তু তুন্দ্রাই সব নয়। তা ছাড়াও মস্ত বড়

বড় জলা জমি আছে সে দেশে। উত্তর-পশ্চিমের সীমানায় এমন কত যে সব বিল আছে, তার শেষ নেই।

রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল 'ইউক্রেন'। এখানকার কালো কালো মাটির মত অমন উর্ব্বর মাটি আর কোথাও হয় না। সে অঞ্চলে হয় মানুষ-সমান উঁচু ঘাসের বন। তাকে বলে 'স্তেপী'! তার মধ্যে বড় বড় ডালপালাওয়ালা কোন গাছ নেই। সেই সব মাটির বুকে জন্মায় গমের শীষ—কোটি কোটি রুশদের প্রাণ হল এই গম। আর কত যে সূর্য্যমুখী ফুল ফুটে থাকে যবের শীষের ফাঁকে ফাঁকে! পথ চলতে চলতে রাশিয়ানরা সেই সব ফুলের বীচি চিবোয়। তাদের কাছে এটা তোমাদের চানাচুরের মত। 'ইউক্রেনে'র বুক জুড়ে হাওয়ার রাজত্ব। শীতের সময় হাড় কাঁপানো উত্তুরে বাতাস আর গরমের সময় বয় ধূলোর ঝড়। বড় হয়ে রুশ সাহিত্য, কি ইতিহাস পড়লে দেখবে সব কিছুতেই স্তেপীর কাহিনী। ইউক্রেনেরই একটা অংশে থাকে কশাকরা। মাঠের পরে মাঠ গিয়েছে চলে। বাধাহীন প্রান্তর। খোলা মাঠে ঘোড়ার ফুর্ত্তি! একবার ছুটলে তাকে আটকায় কে? তাই সে দেশের কশাকরা হল তুর্দ্ধর্ষ ঘোড়সোয়ার।

খাবার জিনিসের যেমন আকাল নেই সে দেশে তেমনি আবার খনিজ পদার্থও আছে বহু রকমের। তাদের দেশে পাওয়া যায় কয়লা, লোহা এই সব ধাতু। ডোনেৎস নদীর অববাহিকায় হচ্ছে এই সব খনি।

রাশিয়ার দক্ষিণ সীমানা গিয়ে পড়েছে কৃষ্ণসাগরে। তারই মধ্যে ক্রাইমিয়া। চমৎকার দেশ, সুন্দর জলবায়ু। আমাদের দেশের বড় লোক পুরী-ওয়াল্‌টেয়ারে যায় হাওয়া বদলাতে আর মজা করতে। রাশিয়ার লোক যেত ক্রাইমিয়াতে। কৃষ্ণ-সাগরের পাড় জুড়ে বড় বড় বাড়ী রয়েছে লোক থাকবার। বিকেলে সমুদ্রের পাড়ে বালুর ভেতর হাঁটা—কি আরামের তাই না? আর দুপুরে সমুদ্রের জলে নাওয়া? পাম আর কমলা নেবুর গাছের ঝাড়ে ঘিরে রেখেছে সবটা ক্রাইমিয়া।

ক্রাইমিয়ার পূবে পাবে 'ককেশাস' অঞ্চল—ভয়ানক পার্ব্বত্য আর বন্ধুর; নানা জাতির লোক নানা ভাষায় কথা বলছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম। উঁচু পাহাড়ের সার দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে প্রাচীরের মত। ইওরোপের সব চেয়ে উঁচু চূড়া হচ্ছে এই পাহাড়েরই এলবুর্জ শৃঙ্গ।

জর্জ্জিয়া প্রদেশ ককেশাসে। জর্জ্জিয়াতে গোরী বলে একটি জায়গা আছে। সেখানে জন্ম হয়েছিল আজকের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা স্টালিনের। বাগানে ঝুলে রয়েছে থোলো থোলো আঙুর। সেই আঙুর নিঙরে রস বের করে তা দিয়ে ইওরোপের সেরা পানীয় তৈরী হয় এদেশে। তবে আঙুরের চেয়ে দরকারী হচ্ছে জর্জ্জিয়ার তেল। মাটির নীচে যন্ত্র বসিয়ে তেল বের করা হয়। সেই তেলের জোরেই চলে মটর গাড়ী—হাজারো রকমের। এত বড় যে

যুদ্ধ হল—তাতে তেলই ছিল প্রাণ। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী হচ্ছে ককেশাসের মেয়েরা। কালো চুলের মাঝে যেন ফুটে রয়েছে জীবন্ত গোলাপ!

এবার চলে এস আরও নীচে তুরস্কের সীমানা আর্ম্মেনীয়ায়। আগের দিনে তুর্কীদের হাতে আর্ম্মেনীয়ার লোক যে কত নির্য্যাতন সহ্য করেছে তার শেষ নেই। আর্ম্মেনীয়া হচ্ছে মালভূমি। উঁচু পাহাড়ে-জমিতে পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা! এদের বাড়ীঘর সব পাথরে তৈরী।

কাস্পিয়ন সাগর ছেড়ে পূবে গেলে পাবে মরুভূমি—চার দিক শুকিয়ে ভেজে পুড়ে আছে যেন। শুধু বালু আর বালু। বালুর সঙ্গে লড়বার জন্যে সে দেশের লোকের পোশাক পরিচ্ছদও করতে হয়েছে তেমনি বিচিত্র! তারা খেজুর খায়, উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত করে। শহরগুলো ছিল ঘিঞ্জী—লোকজন নোংড়া। মেয়েরা বোরখার ভেতর মুখ লুকিয়ে থাকত!

উরাল পর্ব্বত হচ্ছে ইওরোপ আর এশিয়ার সীমানা। উরালের পূবে শুরু হল সাইবেরিয়া। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই! জনমানবশূন্য সাইবেরিয়ার প্রান্তরে আগে রাশিয়ার বিপ্লবী অপরাধীদের নির্ব্বাসন দেওয়া হত। আমাদের দেশেও যারা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে তাদের নির্ব্বাসন দেওয়া হত আন্দামানে। সমুদ্দুরের ওপার থেকে আর কেউ পালিয়ে আসতে পারবে না এই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

আগেই বলেছি সাইবেরিয়া হচ্ছে শীতের দেশ। সেখানের ফল ফুল সবই আলাদা ধরনের। তারই মধ্যে যা ছোটখাট জঙ্গল রয়েছে—তাতেই থাকে হাজারো রকমের বাঘ ভালুক। তবে শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাদের গায়ে লোম বেশী।

সাইবেরিয়ার ইয়াকুত জাতির মত শিকার করতে কেউ পারে না। মাছ ধরতেও তারা ওস্তাদ। সাইবেরিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ছিল ভ্লাদিভস্টক। তার কথা তো আগেই বলেছি। চীনের সীমানায় এ বন্দরটি, ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের শেষ স্টেশন।

রাশিয়ায় মাটির নীচে রয়েছে অফুরন্ত কুবেরের ভাণ্ডার। প্লাটিনাম, তামা, নিকেল, লোহা, কয়লা, টিন, পারা (mercury) রেডিয়াম—এ সব ধাতুই মেলে এখানে। এসব ধাতুগুলোই আজকাল সাত রাজার ধন এক এক মাণিক।

রাশিয়ার বাড়ীঘরের ধরনধারণও বেশ মজার। ইওরোপের মধ্যে খুব নামকরা স্থপতি ছিল রুশদেশে। পুরনো স্থাপত্যের নিদর্শন দেখতে চাইলে দেখতে হবে ক্রেমলিন প্রাসাদ—যেখানে এখন সোভিয়েটের শাসনপরিষদ বসে। কিয়েভ, নভ্‌গরোদ—এই সব প্রাচীন শহরগুলোতে বহু পুরনো স্থাপত্য শিল্প সে অতীত গৌরবের সাক্ষী দিচ্ছে। রঙের জোয়ার যেন সব প্রাসাদে—লাল, নীল, সোনালী, সবুজ, সাদা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে ছাদের ওপর। দেখে রঙ্

বেরঙের পাগড়ীর কথা মনে না হয়ে পারে না। বাইরে সাজানো বড় বড় থাম আর বাগান। ছাদ বোঝাই গোল গোল পেঁয়াজের মত গম্বুজ—কোনোটায় নীল রঙের ভেতর সোনালী তারা খোদাই।

রূপকথার গল্পে তোমরা পড়েছো রাজপুত্তর তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এক ঘুমন্ত দেশে এসে পড়ল। দ্বারী দ্বারে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতীশালে হাতী ঘুমোচ্ছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সোনার দাঁড়ে হীরামন পাখী ঘুমোচ্ছে। ফুলগুলো ঝড়ে পড়ে নি—তবে তাতে আর সৌরভ নেই। সেই ঘুমের দেশে গজমতীর পালঙ্কে ঘুমোচ্ছে রাজকুমারী। সেই রাজকুমারীর শিয়রে আছে জিয়ন কাঠি। তারই স্পর্শে জেগে উঠবে আবার সেই দেশ। রাজকুমারী জাগবে, ঘুমন্ত মোমের বাতিতে আবার জ্বলবে নতুন আলোর শিখা।

এই বিরাট দেশ রাশিয়া ছিল সেই ঘুমন্ত পুরী! ঘুমন্ত পুরীতে চলেছিল রাক্ষসের অত্যাচার কত যুগযুগান্ত ধরে কে তার খোঁজ রাখে। ধীরে ধীরে সবাই জাগল অত্যাচারের বিরুদ্ধে—দেশে এল বিপ্লব। কত তরুণ তরুণী দিল প্রাণ বিসর্জ্জন সে বিপ্লবের আগুনে। শেষে এক দিন সত্যি সত্যি তাদের সে রক্তপাত সফল হল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের ৭ই থেকে ১৭ই মাত্র দশটি দিন। ঐ দশটি দিনই দিল রাশিয়ার রূপ বদলে। যারা ঘুমিয়েছিল,

অজগরের মত তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। রাশিয়ায় নতুন প্রাণের জোয়াড় এল। বলশেভিক বিপ্লবে পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম চাষী মজুর আর অত্যাচারিত নিপীড়িত জনসাধারণ বড়লোকদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিল।

তাদের ঘুম-ভাঙার কাহিনী

এবার শোনো সেই ঘুম ভাঙার কাহিনী।

প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলেছিল রাশিয়ার ঘুম। দেশের বুকে কত কি হল—কিন্তু তার সে ঘুম আর ভাঙলো না। কুম্ভকর্ণের ঘুমের আর শেষ ছিল না।

মাটির নীচের ধাতু পচছিল মাটিতেই। তেল নিচ্ছিল বিদেশীরা! দেশের কলকারখানা চলত বিদেশীদের টাকায়। দেশে রাজা ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল 'জার'। রাণীও ছিলেন। মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদ কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু দেশে থেকেও তাঁরা দেশের দিকে চাইতেন না। জমিদার, ব্যারন, এঁরা সবাই রাজদরবারের খাতিরের লোক। দেশের গরীবরা কোথায় খেতে পাচ্ছে কি না—সে খোঁজে তাদের দরকার কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে রয়েছে তাতেই বা তাঁদের কি যায় আসে? তাঁদের জমিজমা তো ভূদাসরা চাবুকের ভয়ে চষে দিচ্ছে ঠিকমত! সেই ভূদাসদের রক্ত নিঙড়ে যে টাকা পেতেন জমিদার তার

কানাকড়িও রাখতেন না গ্রামে। শহরের বাবুগিরিতে ব্যয় করতেন সবটা! ফসল ভাল হলেও যেমন দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরেও তেমনি! চাষীদের নিজের বলতে কিছুই থাকত না!

ভূদাস কাদের বলে জানো তো? সে বহুদিন আগের কথা। তখন রোমক সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙে পড়েছে। রাজার ক্ষমতা গিয়েছে কমে। জমিদাররাই ছিলেন প্রবল। ইওরোপময় তখন বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। কারুর ধনসম্পত্তি নিরাপদ নয়। চাষীরা ভয়ে ভয়ে ক্ষমতাপন্ন কোনও জমিদারের স্মরণাপন্ন হত আত্মরক্ষার জন্যে। জমিদার সেই সুযোগে তার জমি খাস করে নিতেন, আর চাষীকে থাকতে দিতেন সেই জমিতে। চাষীর জমিতো গেলই—আজীবন সে হল জমিদারের দাস। লুণ্ঠন আর অত্যাচারের হাত থেকে সারা জীবনে তার বাঁচবার উপায় রইল না।

রাশিয়ায় ভূদাসদের ওপর জমিদাররা করতেন অকথ্য অত্যাচার। দুঃখের দিন যেন তাদের কাটতে চাইত না। সংসার চলত কায়ক্লেশে। বাচ্চারা দুবেলা পেটভরে খেতে পেত না। ইস্কুল কলেজে পড়া তো দূরের কথা, তার নামই শুনতে পেত না তারা কেউ।

ভোরে উঠেই ছোট ছোট ছেলেদের খামারে যেতে হত মাথায় খাবার নিয়ে। সেই দুপুরের রোদে তেতে পুড়ে, নয়তো শীতে ঠকঠক করতে করতে বাসায় ফিরে বিশ্রাম না করেই

আবার ছুটতে হত অন্য কাজে। ছোট হলেও এক মুহূর্তের ফুরসৎ ছিল না তাদের। মারপিটের তো কথাই নেই। উঠ্‌তে বসতে পিঠে পড়তো সপাং সপাং চাবুক।

লক্ষ লক্ষ লোক এরকম পশুর জীবন কতদিন যাপন করতে পারে? তাই রাশিয়ার চাষীদের মধ্যেও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। পুগাচেভ ছিলেন এমনি এক বিদ্রোহের নেতা। তবে সে বিদ্রোহ সফল হতে পারে নি।

দিন বয়ে যায়—বসে থাকে না। ইংল্যাণ্ডে হল শিল্প-বিপ্লব। তারই ঢেউ এল রাশিয়ায়। সে-দেশেও দু-চারটে করে কলকারখানাওয়ালাদের সৃষ্টি হল। কিন্তু ভাল করে কলকারখানা করতে হলে চাই লাখো লাখো মজুর। দেশের যারা মজুর হতে পারত তারা তো হচ্ছে সব ভূদাস। জমিদারদের হুকুমে তাদের ওঠাবসা করতে হয়। জমিদার কেন তাদের কারখানায় কাজ করতে দেবেন? তাহলে কলের মালিক মজুর পাবে কোথায়?

কলের মালিকরা দেখলেন যে ভূদাস প্রথা টিকে থাকলে কারখানা করা অসম্ভব। তখন থেকেই এঁদের একদল লোক রাশিয়া থেকে ভূদাস প্রথা তুলে দেবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। জার ছিলেন জমিদারদের দলে—তাই তিনি কলের মালিকদের বিশেষ সুবিধা দিতে কোন কালেই রাজী হন নি।

ভূদাসদের মুক্তির জন্যে তখন রাশিয়াতে গোপন আন্দোলন গড়ে উঠল। যারা সে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাঁদের দলের নাম ছিল নারোদনিক। আমাদের দেশে সমাজসেবা বলতে যা বুঝি, এঁদের কাজ ছিল তাই।

শুধু নারোদনিকই নয়; আরও নানা গুপ্ত সমিতি ছিল রাশিয়াতে। এমনি একদলের নেতা ছিলেন তরুণ যুবক পিসারেভ। তিনি কারুর কোনই শাসন মানতেন না। 'কারুর তাঁবে থাকবো না'—এই ছিল তাঁর আদর্শ। এঁদের বলা হত নিহিলিস্ট। রুশ ভাষায় 'নিহিল' শব্দের মানে হল 'কিছু না।' নিহিলিস্টরা কিছুই মানত না।

এঁদের সব আন্দোলনের ফলে রাশিয়াতে ধীরে ধীরে শাসন সংস্কার হচ্ছিল। এদিকে সেই সময় ইওরোপে চলছিল নানা গণ্ডগোল। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের লড়াই লেগেই ছিল। সে সব যুদ্ধে রাশিয়া মোটেই সুবিধে করতে পারছিল না। তাতে দেশের মধ্যে খুব অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা সেই সুযোগে দেশে নিজেদের দল ভারী করে নেয়।

তখন জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহ হতে পারে মনে করে আগে থাকতেই জার ১৮৬১ খৃঃ ভূদাস প্রথা তুলে দেন। তাও আবার কেমন? তাদের মুক্তি দেওয়া হল বটে

কিন্তু সে মুক্তির দাম আদায় করা হল তাদের কাছ থেকে। চাষীদের মাথায় ২০০ কোটি রুবলের দেনা চাপিয়ে দেওয়া হল আর তাদের আগের অনেক জমিজমা জমিদাররা বে-দখল করে নিল।

চাষীরা তো এবার স্বাধীন হল। তাদের চলাফেরার ওপর আর কারুর কোন কথা বলার ছিল না। কিন্তু তারা খাবে কি? জমিদারদের কাছ থেকে খুব চড়া খাজনা দিয়ে জমি পত্তন নিতে হত তাদের। বছর বছর ঠিক সময় খাজনা দেওয়া আর হয়ে উঠত না। সময় সময় অনেককে বেগার খেটে খাজনা শোধ দিতে হত। তাদের যা কিছু শস্য জন্মাতো তার তো অর্দ্ধেকের উপরই বিক্রী করে জমিদারদের পাওনা মেটাতে হত।

এমনি করে জমিদারদের পাওনা মেটাতে গিয়ে অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হত। পথের ভিখারীর সঙ্গে তাদের কোনই তফাৎ থাকত না। তারা তখন দলে দলে কারখানায় কাজ করতে ছুটত।

রাশিয়ার জমি পাথরের মত শক্ত। বলদ কি মোষ দিয়ে সে জমি চাষ করা যায় না, ঘোড়া দরকার হয়। ঘোড়াই লাঙল টানে। ঘোড়ার দামও বেশী। তাই গরীব চাষীদের অনেকেরই ঘোড়া কেনা হয়ে উঠত না। নিজেরা কায়ক্লেশে যতটা পারত চাষ করত। বাকী জমি কুলাক বা জোতদারদের হাতে দিয়ে দিত। যেটুকু জমি তারা



জোসেফ স্টালিন—সোভিয়েট নেতা

সুখে দুঃখে যিনি দেশের লোকের পাশেই থাকেন



মিখাইল কালিনিন—সোভিয়েট রাষ্ট্রের সভাপতি

চাষ করত তা থেকে সম্বৎসরের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। চাষবাস ছাড়াও তাদের অন্য কাজ না করলে চলত না।

যেমন চাষী তেমনি মজুর। দেশে কলকারখানা হওয়ায় ধীরে ধীরে মজুরের দল বাড়ছিল তখন রাশিয়ায়। তাদের অবস্থা ছিল ভীষণ খারাপ। দিনভরে বারো চৌদ্দ ঘণ্টা করে খাটতে হত। মেয়ে কি ছোট ছেলেদেরও রেহাই ছিল না। সমান খাটলেও পুরুষদের চেয়ে তাদের মাহিনা ছিল অনেক কম। তাছাড়া কলকারখানায় যন্ত্রপাতির মধ্যে কাজ করতে গেলে হাজারো রকমের বিপদ ঘটতে পারেতো।

কারুর হয়তো হাত কেটে যায়—কারুর যায় পা—কারুর হয়তো চোখ, আরো এমনি কত কি! যেই কেউ জখম হল তখন থেকেই গেল তার মজুরী খতম হয়ে! সে যে এতদিন ধরে খাটল তার কোন দামই রইল না! ডাক্তার ডাকতে হলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করতে হত। মজুররা থাকত গরু-ভেড়ার মত। ছোট ছোট ঘরে ১০।১২ জন ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকত তারা। তাদেরই হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে তাদেরই চোখের সামনে গড়ে উঠছে মালিকদের বড় বড় অট্টালিকা, ব্যাঙ্কে জমছে লাখ লাখ টাকা—আর তারা কিনা থাকছে জন্তুর মত! বাধ্য হয়ে মজুররা একজোটে এ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাল। তাদের তো হাতে অন্য অস্ত্র নেই। তারা করল কাজ বন্ধ! কলকারখানার মনে কলকারখানা

রইল পড়ে—মজুররা গেল না কেউ সেগুলো চালাতে। কল না চললেই তখন মালিকদের টনক নড়ল। রাগের মাথায় আবার অনেক মজুর যন্ত্রপাতি সব ভেঙে চুরমার করে ফেলল।

প্রথম প্রথম অনেক ধর্ম্মঘট সফল হয় নি। পয়সার লোভে মজুররা অনেকেই ধর্ম্মঘট ভেঙে দিয়েছে।

ক্রমে তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝতে পারল যে যতক্ষণ তারা এক হয়ে মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারছে—ততক্ষণ তাদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না। তারা তখন নিজেদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলল। এসব মজুর সংগঠনকে ইংরাজীতে বলে ট্রেড ইউনিয়ন (Trade union)। ইউনিয়নের মারফত তখন মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকরা লড়াই চালাত। খালটুরিন নামে একজন ছুতোর ও অব্‌নর্স্কি নামে এক ফিটার মিস্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর রাশিয়ায় প্রথম মজুরদের ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা—১৮৭৮ সালে। তারও আগে ১৮৭৫ সালে দক্ষিণ রাশিয়ায় ওডেসা বন্দরে ছিল তেমনি এক ইউনিয়ন। জার সরকার জোর করে এসব ইউনিয়ন ভেঙে দিয়েছিলেন।

একটা ইউনিয়ন ভেঙে দিলে আবার অন্য জায়গায় আর একটা গড়ে উঠত। তাদের আন্দোলনের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কারখানায় নতুন আইন জারী করতে হয়েছিল জারকে।

রাশিয়ায় যখন মজুররা ইউনিয়ন গড়ছিল তার আগেই

ইউরোপে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস মজুর আন্দোলন কি ভাবে সফল হতে পারে তা দেখিয়েছিলেন।

তাঁরা কি বলতেন জানো ? পৃথিবী সুদ্ধ সর্ব্বহারা মজুরদের পায়ের পরাধীনতার বেড়ী ছাড়া আর কি হারানোর ভয় আছে ? অথচ তাদের সামনে রয়েছে বিরাট ভবিষ্যৎ! একবার পায়ের বেড়ী ভেঙে স্বাধীন হতে পারলে তারা পৃথিবীতে করবে স্বর্গ রচনা !—তবে তার জন্যে চাই একতা ! "দুনিয়ার মজুর এক হও"—এই ছিল তাঁদের শিক্ষা !

মজুরদের এক হয়ে বিপ্লব করে মালিকদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে হবে। সে জন্যে দরকার প্রত্যেক কল-কারখানায় মজুরদের নিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা।

মালিকেরা কখনোই ইউনিয়ন গড়তে দেবে না। সুযোগ পেলেই তাই রাশিয়ার মজুর আন্দোলনের নেতাদের ধরে জেল ফাঁসী আর নির্ব্বাসনে পাঠানো হত। ১৮৮১ সালের ১লা মার্চ্চ নারোদনিকরা জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করেছিল। কিন্তু মৃত জারের জায়গা দখল করলেন তৃতীয় আলেকজাণ্ডার। শ্রমিক, কৃষকের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হল। কয়েকজন লোককে মারলেই যে সমাজে বিপ্লব আসতে পারে না এ ধারণা নারোদনিকদের ছিল না। তাতে বরঞ্চ সত্যিকারের বিপ্লবের ক্ষতিই হয়।

রাশিয়ায় তখন মার্ক্স এঙ্গেলেস-এর শিক্ষা নিয়ে জায়গায় জায়গায় মজুরদের দল গড়ে উঠছিল। প্লেখানভ ছিলেন এদের

মধ্যে বিখ্যাত নেতা। বইএর পর বই লিখে তিনি মার্ক্সবাদ বোঝাতে চাইলেন সবাইকে। নারোদনিকদের কোথায় ভুল হচ্ছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের ভুল ধরিয়ে দিলেন তিনি। প্লেখানভের নেতৃত্বে তখন মজুরদের মধ্যে কাজ করার জন্যে নানা স্থানে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। তার নাম হল 'শ্রমিক মুক্তি সংঘ'! প্রথম প্রথম ছাত্রদের ও মধ্যবিত্তদের নিয়েই এ সব সংঘের কাজ হত। মজুরদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল খুব কম।

সত্যিকারের মজুর আন্দোলন গড়বার ভার পড়েছিল লেনিনের ওপর।

বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ (লেনিন) ১৮৭০ সালে রাশিয়ার সিমবির্স্ক শহরে জন্মেছিলেন। তাঁর এক ভাই নারোদনিকদের গোপন দলে ছিলেন। জারকে বোমা মারতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি ফাঁসীতে মারা যান। লেনিন তখন স্কুলের ছাত্র। ভাইয়ের মৃত্যুতে বাড়ীসুদ্ধ থমথমে ভাব দেখে তার মনে ভীষণ আঘাত লাগে। অদ্ভুত প্রতিভাশালী বলে তখন থেকেই তাঁর মনে হয় যে নিশ্চয়ই দাদা যে পথে দেশের মুক্তি খুঁজছিলেন তা ভুল। বিপ্লবের পথ তিনিও বেছে নিলেন। দাদার ফাঁসীতে ভয়ে পেছুপা হন নি। ১৮৮৭ সালে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কিন্তু দেখতে দেখতে তিনি সেখানে ঘোর বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিলেন। স্কুল কলেজে তখন গিজগিজ করছে জারের

গোয়েন্দা পুলিশ। লেনিন তাদের হাতে ধরা পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর নাম কাটিয়ে দেওয়া হয়। লেনিন তখন থেকেই কাজানের মার্ক্সবাদী দলে যোগ দেন। মার্ক্সের মতেই যে দেশের মুক্তি সম্ভব এটাই ক্রমে ক্রমে তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মালো। তিনি দিনরাত শুধু মার্ক্সের আর এঙ্গেলসের লেখা পড়তে লাগলেন আর তাথেকে নোট নিতে লাগলেন।

অল্পসময়ের মধ্যেই মার্ক্সবাদীদের মধ্যে পণ্ডিত বলে লেনিনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। কাজান থেকে তিনি চলে আসেন সেণ্টপিটার্সবুর্গে। সেণ্টপিটার্সবুর্গই তখন রাশিয়ার রাজধানী। শুধু মার্ক্সবাদই নয়, তিনি অন্যান্য নানা বিষয়েও গভীর পড়াশুনা করতেন।

মনপ্রাণ সঁপে তিনি রাশিয়াতে শ্রমিকদের একটি সুগঠিত দল গড়তে চেষ্টা করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অভ্রান্ত নেতৃত্বে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠিত হয়েছিল। মজুরদের মধ্যে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়তে দেখে জারের পুলিশ তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন দেয়। সেখানেরই একজন বিপ্লবী মেয়ের সঙ্গে নির্ব্বাসনে থাকতেই তাঁর বিয়ে হয়। ইনি হলেন নাদেজদা কন্‌স্টান্টি-নোভনা ক্রুপ্‌স্‌কায়া।

নির্ব্বাসনে দিন কাটাবার জন্য তো আর লেনিন সৃষ্টি হন নি। তিনি চান বিপ্লব—জেলে বসে থাকা তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তাই তিনি জারের পুলিশকে ফাঁকী দিয়ে নির্ব্বাসন থেকে পালিয়ে বিদেশে চলে আসেন। পশ্চিম ইওরোপের নানা দেশে ঘুরে ঘুরে লেনিন তখন কাজ করতেন। রাশিয়ার আন্দোলনের সঙ্গে গুপ্তভাবে সমস্ত যোগাযোগ বজায় রাখা হত। গোপনে চলত বিপ্লবের সব কাজ।

সেই গুপ্তব্যবস্থা এত পাকা হাতে থাকত যে বাইরে থাকলেও লেনিন দলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর পেতেন।

বিদেশে বসেই তিনি "ইস্ক্রা" বা 'স্ফুলিঙ্গ'—নামে কাগজ ছাপাতেন। সেই কাগজ গোপনে রাশিয়াতে চালান দেওয়া হত হাজারে হাজারে। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সে সব কাগজ পড়ত মজুররা। কি করে বিপ্লব করতে হবে তার সব নির্দ্দেশ থাকত তাতে।

এই সময়ে রুশ-জাপানে ভীষণ যুদ্ধ বেধেছিল। সে যুদ্ধে জার হেরে যান। যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় দেশের মধ্যে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দেয়। একে যুদ্ধের কষ্ট তার ওপর জারের অত্যাচার। সুযোগ বুঝে লেনিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন। নাবিক ও সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী কাজ চালানো হতে থাকে কখন। শ্রমিকদের দল গড়ে গোপনে গোলাগুলি ছোড়া শেখানো হয়েছিল। বিদেশ থেকেও অস্ত্র কিনে গোপনে রাশিয়াতে পাঠানো হত।

রাশিয়ার নানা প্রদেশে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাইরের সৈন্যবাও অনেকে বিপ্লবী দলে চলে আসে। কিন্তু

বিপ্লবীদেরও দোষ ত্রুটি কম ছিল না। সেই সব দোষ ত্রুটি টের পেয়ে নৃশংস অত্যাচার করে জার সেবারকার মত বিপ্লব দমন করেছিলেন। তবে তিনিও কতকগুলো সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেবার।

বিপ্লব সফল না হওয়ায় লেনিনদের কাজের ভয়ানক ক্ষতি হল। জারের অত্যাচারে দেশের লোক উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠল। সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল হতাশা। লেনিনের নেতৃত্বে তখন বিপ্লবীরা নতুন প্রেরণা লাভ করল।

এর আগেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টীতে লেনিনের সঙ্গে আর এক দলের মতভেদ হয়। ক্রমে সেই বিভেদ বেশী হতে থাকে। বেশীর ভাগ দলবল ছিল লেনিনের পক্ষে। তাদের নাম হল বলশেভিক। রুশ ভাষায় বলশেভিক কথার মানেই হল "বেশীর দল"। অন্যদল হল মেনশেভিক। ১৯১২ সালে বলশেভিকরা নিজেরাই ভিন্ন একটি দল গড়ে লেনিনের নির্দ্দেশ মত বিপ্লবের পথে চলতে থাকে।

তার কিছুদিন পরেই ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। একদিকে জার্ম্মানী, তুরস্ক, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স—আরও অনেকে।

সে যুদ্ধে রাশিয়ার খুব ক্ষতি হয়েছিল। রুশ সৈন্যদের বীরত্বের তুলনা নেই; কিন্তু তাদের সেনাপতিরা ছিলেন অকর্ম্মণ্য; অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল ভীষণ। তাই লক্ষ লক্ষ

সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েও যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি বই লাভ হয় নি। যুদ্ধে সুবিধা না হওয়ায় সৈন্যরা ক্ষেপে গেল। দেশের লোকের হাতে খাবার ছিল না। সবকিছু জিনিসপত্রের দাম তিনচারগুণ বেশী হয়েছিল। শত শত গরীবরা না খেতে পেয়ে মরতে লাগল। এক টুকরো রুটির জন্য একমাইল লম্বা লাইন হত লোকের। এমনি ভাবে যুদ্ধের তিনটি বছর কাটে। ১৯১৭ সালের প্রথমে দেশের লোক আর দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করে। মজুরের ধর্ম্মঘটে দেশ ছেয়ে গেল। চারিদিকে লক্ষ লক্ষ লোক শোভাযাত্রা করতে লাগল। "জার নিপাত যাক," "শান্তি চাই, রুটি চাই," ছিল তাদের ধ্বনি।

ফেব্রুয়ারীতে মস্কৌএ সবচেয়ে বড় গোলাবারুদের কারখানা "পুটিলভ"এর সমস্ত মজুররা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তাদের বুলিই হল—"জার নিপাত যাক"। দেখতে দেখতে সমস্ত রাশিয়াময় ধর্ম্মঘটের হিড়িক আরম্ভ হল। ধর্ম্মঘট বন্ধ করার জন্য যে পুলিশ আর সৈন্য এল তারা কেউ কিন্তু গুলি ছুঁড়তে রাজী হল না। দেশের ভাই এর গায় গুলী ছুঁড়তে তারা অস্বীকার করল। জারের কর্ম্মচারীরা জোর গলায় গুলী ছোঁড়ার আদেশ দিয়ে নিজেরাই রক্ত চক্ষু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই জনসমুদ্রে। তাদের পেছনে পেছনে এল কাতারে কাতারে কশাক সৈন্য। তারা কিন্তু চলল নির্ব্বিকার ভাবে। তাদের লাঠি বা বেয়নেট কিছুই চলছিল না।

অফিসারদের হুকুম শুনে শোভাযাত্রার লোকের তো আক্কেল গুরুম। অথচ কশাকরা তাদের বলল না কিছুই। তারা আবার চলতে চলতে হাসছে আর চোখ টিপছে! জনতা চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে ফেলল—“জয় কশাকদের জয়” বলে।

এদৃশ্যে রাজদরবারের লোক প্রমাদ গুণল। জার তখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারা তখুনি তাঁকে টেলিগ্রাফ করে যে “রাজধানীতে বিপ্লব হয়েছে।”

জার সেই খবর পেয়ে পদত্যাগ করেন। তখন প্রিন্স ল্বভ-এর নেতৃত্বে এক অস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় রাশিয়াতে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সব লাট সাহেবকে বরখাস্ত করা হল। তার যায়গায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা আগে যে পরিষদ নির্ব্বাচন করত সেগুলোর হাতে এল শাসন ক্ষমতা। সেই বিপ্লবের ডামাডোলে আপনা থেকেই ঠিক ১৯০৫ সালের মত নানা সোভিয়েট গড়ে উঠল। সোভিয়েট হচ্ছে আমাদের দেশের পঞ্চায়েতের মত। কলকারখানা ও অন্য বিভিন্ন কাজের মজুররা এক হয়ে নিজেদের ভেতর থেকে লোক নিয়ে এই সব সোভিয়েট বা পঞ্চায়েত গড়ত। মজুরদের মত চাষী ও সৈন্যদের মধ্যেও হু হু করে সোভিয়েট গড়ে উঠল। যারা সোভিয়েটে এসে যোগ দিল—তারা সোভিয়েট ছাড়া আর তাদের কথা মানত না। তাদের কাছে সোভিয়েটই হল দেশের মালিক।

জার সিংহাসন ত্যাগ করার এক মাসের মধ্যেই রাশিয়ার

সমস্ত অঞ্চলের সোভিয়েটদের প্রতিনিধি নিয়ে সেণ্টপিটার্স-বুর্গে এক বিরাট সম্মিলনী হয়েছিল।

এ সমস্ত সোভিয়েটগুলোই তখন জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখছিল। এদের ভেতর থেকে অনেক প্রতিনিধিকেই অস্থায়ী সরকারের মধ্যে নিতে হয়েছিল।

রাশিয়ায় তখন চলেছিল পাশাপাশি হুটো সরকার। নেভানদীর তীরে জারের 'শীতের প্রাসাদে' (Winter Palace) ছিল অস্থায়ী সরকার। তার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের নাড়ীর যোগ তেমন ছিল না। আর তার একটু দূরেই আগের সৌখীন মেয়েদের স্কুল "স্মোলনী ইন্‌ষ্টিটিউটে" ছিল সোভিয়েটের প্রধান আফিস। লক্ষ লক্ষ চাষী, মজুর আর সৈনিক রোজ এসে জড়ো হত সেখানে।

এরকম অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। ঠিক তেমনি সময় নির্ব্বাসন থেকে লেনিন দেশে ফিরে আসেন। সোভিয়েটের যখন পত্তন হয়েছিল তখন শুধু লেনিন আর বলশেভিকদের কথা মত তারা চলত না! মেনশেভিকরাও সোভিয়েটে ছিল। তারাই প্রধানতঃ অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী হয়েছিল! এদের মধ্যে কেরেন্‌স্কীর নামই বেশী বিখ্যাত। তিনিই পরে অস্থায়ী সরকারের কর্ত্তা হয়েছিলেন।

লেনিন এ ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ক্রমাগত লিখে আর বক্তৃতা করে চাষী মজুরদের বোঝা-

চ্ছিলেন যে বিপ্লব যখন হয়েছে তখন সবাইকে শেষ পর্য্যন্ত লড়তে হবে। দেশের জমিজমা এতদিন ধরে জমিদারেরা ভোগ করছিল। এবার চাষীদের মধ্যে সব জমি বিলি করে দিতে হবে। কলকারখানাও সব হবে মজুরদের। তারা নিজেরাই সে সব কলকারখানা চালাবে। তাদের শোষণ করবার কেউ থাকবে না। আর এই সোভিয়েটকেই জোর করে অস্থায়ী সরকারের হাত থেকে শাসন কেড়ে নিতে হবে। জার না থাকলেও অস্থায়ী সরকার ছিল বড়লোকদের নিয়ে তৈরী। তারা জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাই লেনিন বললেন আবার বিপ্লব করতে। তাঁর কথায় ভয় পেয়ে পুলিশ তাকে ধরবার চেষ্টা করে। তিনি তখন ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে যান।

অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ বন্ধ করে নি। সৈন্যেরা অথচ শান্তি চায়। বাধ্য হয়ে তারা সব পালিয়ে যেতে লাগল। গ্রামে গ্রামে চাষীরা জোর করে জমিজমা কেড়ে নিজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছিল।

কেরেনস্কীর সরকার দেশে শান্তি স্থাপন করতে না পারায় সেনাপতিদের মধ্যে থেকে 'কর্নিলভ' কেরেনস্কীকে তাড়িয়ে দিয়ে কর্ত্তা হয়ে বসতে চান। লেনিনের অভ্রান্ত নেতৃত্বে আর স্টালিনের পরিচালনায় ইতিমধ্যে সোভিয়েটে বলশেভিকদের প্রভাব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। তখন লেনিন বিপ্লবের আহ্বান জানান।

পেট্রোগ্রাদের সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা দখলের জন্য বিপ্লবী কমিটি গড়ে তোলে। মজুররা দলে দলে সেখানে 'লাল বাহিনী'তে (Red Guard) ভর্ত্তি হল। এতদিনের জমানো অস্ত্রশস্ত্র থেকে তাদের হাতে বন্দুক ও রাইফেল দেওয়া হল। কর্ণস্‌ডাটের সৈন্যরাও বিদ্রোহ করবে বলে রাজী থাকায় তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হল।

৭ই নভেম্বর ভোর ছটোর সময় সেনাবাহিনীর একটি দল নিঃশব্দে সেণ্টপিটার্সবুর্গের দরকারী জায়গাগুলো সব ঘিরে ফেলল। রেল স্টেশন, টেলিগ্রাফ আফিস, ইলেকট্রিকের প্রতিষ্ঠান, নেভানদীর ওপরের পুল—সব তারা দখল করল। 'শীতের প্রাসাদে' যেখানে অস্থায়ী সরকার বসত সেগুলোও ঘেরা হল। কর্ণস্‌ডাটের নাবিকরা তখন 'আরোরা' বলে যুদ্ধ জাহাজে চড়ে নেভানদী দিয়ে হিমপ্রাসাদের সম্মুখে কামান দাগবার জন্য তৈরী হল। কেরেনস্কী ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন। সেই রাত্তিরেই 'লাল বাহিনী' 'শীতের প্রাসাদ' দখল করল। অস্থায়ী সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হল।

লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সব শাসন ক্ষমতা দখল করে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করল।

এই হল বিশ্ববিখ্যাত নভেম্বর বিপ্লব। ঘুমন্ত রাশিয়ার জনসাধারণ জেগে উঠল বলশেভিক পার্টির সোনার কাঠির ছোঁয়ায়! জমি এল চাষীদের হাতে—জমিদারী পেল লোপ।

বড় বড় কলকারখানার মালিকদের হাত থেকে কারখানা এল কারখানা সমিতির হাতে। ব্যাঙ্ক, রেল কোম্পানী সব কিছুরই মালিক হল নিপীড়িত জনসাধারণ—চাষী আর মজুর।

সেই দারুণ উপপ্লবের দিনে

বিপ্লব তো হল! চারিদিকে রক্তারক্তি কাণ্ড—দেশে খাবার নেই, এখানে সেখানে গরীবের দল ভিড় করে খাবারের জন্যে আকাশ ফাটাচ্ছে। চোর ডাকাতের দলও সুযোগ বুঝে লুঠতরাজ আরম্ভ করেছে। ডামাডোলের মধ্যে কে খোঁজ রাখে চোর ডাকাতের? গুণ্ডা ডাকাতরাও নিজেদের বিপ্লবী বলে জাহির করে বড়লোকদের ধনসম্পত্তি লুঠ করছিল। তবে সোভিয়েট পুলিশের হাতে পড়লে আর তাদের রক্ষে ছিল না!

বড়লোকরা দেখল বিপদ। কেউ তাদের কথা শোনে না। সকলের মুখে খালি সোভিয়েট আর লেনিনের কথা। কলকারখানা সব সোভিয়েটের দখলে। তারা তখন চাইল সোভিয়েট ধ্বংস করে ফেলতে। দেশ বিদেশের বড়লোকদের সাহায্য চাইল তারা।

এদিকে যুদ্ধ তখনো থামে নি। লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য জার্মানদের সঙ্গে লড়ছিল। যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্রমে

যুদ্ধের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সুযোগ পেলেই দলে দলে রুশ সৈন্য আসত পালিয়ে। লেনিন সে জন্যে চাইলেন জার্ম্মানদের সঙ্গে সন্ধি করতে। তাহলে সেই অবসরে সোভিয়েটের লাল ফৌজ গড়ে তোলা যেতে পারে। শুধু লাল ফৌজ গড়লেই হবে না। দেশের শিল্প, বাণিজ্য সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আবার সেগুলোও নতুন করে চালাতে হবে। তা না হলে দেশের লোক খাবে কি, পরবে কি? লেনিন দেশের সবাইকে বোঝালেন সেই কথা। এখন আর অন্যের জন্যে কলকারখানায় খাটতে হবে না তো। সব কারখানাই মজুরদের। কাজেই দেখতে দেখতে চারিদিকে কাজের সাড়া পড়ে গেল। ভাঙাচোরা কলকারখানায় আবার কাজ হতে শুরু করল। লাল ফৌজের দল ভারী হয়ে উঠল।

সোভিয়েটে যতই ভালভাবে কাজ হতে দেখল বড়-লোকরা ততই ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল। তারা আর দেরী না করে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। যত বড়লোক মিল মালিক আর জমিদাররা মিলে দেশের নানা দিকে বিদ্রোহ করে গরীবদের নতুন রাজ্যটি ধ্বংস করতে চাইল। দেশ-বিদেশের নানা রাজ্য থেকে তারা গোলাগুলি, কামান বন্দুক আনতে লাগল তাদের কাছে। কর্নিলভ বলে একজন জারের আমলের সেনাপতি ককেশাসের সোভিয়েটের বিরুদ্ধে মাথা তুলল ১৯১৮ সালে। 'এর পর থেকে প্রায় দুবছর

ধরে সোভিয়েটকে বড়লোকদের চক্রান্তের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল।

কর্ণিলভের পরে ডেনিকিন কশাকদের নিয়ে সোভিয়েট বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ইউক্রেনে জার্ম্মান সৈন্যরা এক জন সোভিয়েট বিরোধী সেনাপতি ক্র্যাসনভকে সাহায্য দিচ্ছিল। উত্তরের বরফে ঘেরা অঞ্চলে ইংরাজরা সৈন্য পাঠিয়ে সোভিয়েট বিপ্লব দমন করেতে চেয়েছিল। সাইবেরিয়াতে কোলচাক বলে একজন সেনাপতি জাপানের সাহায্যে দেশ জয় করছিল।

সোভিয়েটের মাথার ওপর ইংরাজ সৈন্য, বুকের কাছে জার্ম্মান, পোল, ফরাসী সৈন্য, পায়ের নীচে ডেনিকিন!

শুধু কি তাই! যুদ্ধ থামিয়ে দিলে যত সব যুদ্ধের বন্দীদের তাদের নিজেদের দেশে ফেরৎ পাঠাতে হয়। এমনি একপাল চেকোশ্লোভাকিয়ার যুদ্ধ বন্দারা সাইবেরিয়াতে যেতে যেতে জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সোভিয়েটের বিপক্ষে দাঁড়াল।

সোভিয়েটের তখন বিষম বিপদ! ইংরাজ, ফরাসী, জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মানীর সাহায্যে বিপ্লব বিরোধী সেনাপতিরা সোভিয়েটের শিল্পপ্রধান অঞ্চল প্রভৃতি সব কেড়ে নিয়েছিল। এক টুকরো রুটি কি সামান্য মাংসও ছিল না দেশে। মজুররা থাকত উপোসী! কাঁচা মাল কী জ্বালানির অভাবে কলকারখানাও বন্ধ! ভেবে দেখ তাদের কি দুরবস্থা।

কিন্তু সোভিয়েটের মজুর একটুও দমে নি। বিপ্লবকে সফল করার জন্য তারা সব রকম স্বার্থত্যাগ করতে রাজী হল। বলশেভিকরা খোলাখুলি বললেন যে, সোভিয়েট বিপন্ন, সবাইকে প্রাণপণ করে তাকে বাঁচাতে হবে। দেখতে দেখতে তাদের আহ্বানে সারা দেশ মেতে উঠল। লক্ষ লক্ষ মজুর চাষী ছুটল লালফৌজে যোগ দিতে। খাবার দাবার যোগাবার জন্যেও নানা সমিতি গড়ে উঠল। দেশের শত্রুরা কেউ কোথাও এতটুকু খাবার মজুত করার সুবিধে পেল না। শত দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে তারা এগোলো লেনিনের আহ্বানে। ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে জার্ম্মানীর পতন হয়। তখন ইংরাজ ও ফরাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে সোভিয়েটকে আক্রমণ করে। সোভিয়েটের পক্ষে তখন ট্রটস্কী ছিলেন যুদ্ধের কর্ত্তা। অথচ তিনি পদে পদে ভুল করছিলেন। তাঁর ভুলের জন্য প্রায় সমস্ত সোভিয়েট রাজ্যই শত্রুরা দখল করেছিল। মস্কৌ, পেট্রোগ্রাদ পর্য্যন্ত তারা ঘিরেছিল। তখন দেখা দিল ভরোশিলভ, ফ্রুঞ্জে, স্ট্যালিনের নেতৃত্ব। তাঁদের পরিচালনায় ও লালফৌজের অতুলনীয় বীরত্বে ফরাসী ও ইংরাজ বাহিনী প্রত্যেক জায়গা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কর্ণিলভ মারা যায়; সাইবেরিয়াতে কোলচাক বন্দী হয়।

তখন সাইবেরিয়াতে লোকে মুখে মুখে গাইত এই মজার গানটী—

ইংরেজের উর্দ্দী, উর্দ্দী আজ ছিন্নভিন্ন
আর ফরাসীর সাজ। নিরুদ্দেশ বেশ।
জাপানী তামাক খেয়ে, তামাকের চিহ্ন নেই
কোলচাকের নাচ ॥ কোলচাকের শেষ ॥

কর্ণিলভের জায়গা নিয়েছিলেন ডেনিকিন। তিনিই প্রথমে মস্কৌ পর্য্যন্ত ঘিরেছিলেন। লালফৌজের আক্রমণে তিনি পিছিয়ে আসতে থাকেন। এমনি ভাবে মরণপণ করে যুদ্ধ করতে করতে লালফৌজ ১৯২০ সালে সমস্ত ইউক্রেন মুক্ত করে নেয়। ঐ বছরেই ইংরাজ ফরাসীরাও সোভিয়েটের সঙ্গে সামনা সামনি যুদ্ধ করা থামিয়ে দেয়। একে লালফৌজের বীরত্ব— তায় আবার ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মজুররা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কোন কাজেই সাহায্য দিচ্ছিল না। ইংলণ্ড ফ্রান্সের যুদ্ধ না থামিয়ে কোন উপায়ই ছিল না।

ইংরাজ আর ফ্রান্সের সরকার নিজেরা না পারলেও পোল্যাণ্ডকে দিয়ে সোভিয়েট ধ্বংস করতে চাইল। পোল্যাণ্ডে পিলসুদ্স্কী তখন কর্ত্তা। তিনি ছিলেন মজুর বিপ্লবের বিরোধী। তাই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নি। তাঁকে সাহায্য করে র‍্যাংগেল বলে এক বিপ্লববিরোধী রুশ সেনাপতি। তবে বুদেনী ও ভরোশিলভের বিদ্যুৎ আক্রমণের মুখে তাদেরও বেশী দিন যুদ্ধ করতে হয় নি। ১৯২০ সালের শেষে তারাও চূড়ান্ত ভাবে হার মানতে বাধ্য হয়। শুধু দূরে সাইবেরিয়াতে জাপানীরা ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তারপর তাদেরও পালিয়ে আসতে হয়েছিল।

এতদিনে সোভিয়েটের মুক্তি যুদ্ধ শেষ হল। পৃথিবীর মহামহোপাধ্যায়রা সবাই ভেবেছিলেন যে ১৪টি জাতির আক্রমণ সহ্য করে কি আর সোভিয়েট বাঁচতে পারবে। তাদের না আছে কামান বন্দুক—না ভাল সেনাপতি। কিন্তু তবু চাষী মজুররাই নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে তাদের হারিয়েছে। সোভিয়েট যে তাদের নিজেদের রাজ্য কি না তাই তারা প্রাণপণ করে লেনিনের কথা মেনে চলেছে—দেশের জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও দিতে কার্পণ্য করে নি।

সোভিয়েট তার স্বাধীনতা হারালো না। তবে এতদিন একভাবে যুদ্ধ করে সোভিয়েটের আর্থিক অবস্থা যা হল তা বলবার নয়। ইউক্রেনই হল তাদের অন্নদাতা আর সেই ইউক্রেনের বুকেই চলেছিল বিপ্লববিরোধীদের অত্যাচার। চাষীরা চাষবাস করবে কি প্রাণ বাঁচাতেই অস্থির! সমস্ত দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। ১৯২১ সালের সে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা মনে করে সোভিয়েটের লোক আজও শিউরে ওঠে। সে দুর্ভিক্ষের খবর পেয়ে নানা দেশ থেকে সাহায্য পাঠাল সোভিয়েটে; কিন্তু ঐ সব দেশের কর্ত্তারা সোভিয়েটকে দেখতে পারতেন না বলে সে সব খাবার তাদের পাঠাতে দেন নি। তাঁরা বলে পাঠালেন যে সোভিয়েট যদি সাম্যবাদ ছেড়ে দেয় তো তাঁরা সাহায্য করতে রাজী

আছেন। তা কি কখনো হয়? তারা মরবে তবু মাথা নোয়াবে না!

দুঃখের দিনও একদিন ফুরোয়। সোভিয়েটের দুর্ভিক্ষও তারা কোন রকমে কাটিয়ে উঠল। সোভিয়েটের বিপদ কিন্তু তখনো কাটে নি। দেশের কলকারখানা না চালালে দেশের অবস্থা আরও সাংঘাতিক হবে। বড়লোকরা তখনো সোভিয়েটের বিপক্ষেই ছিল বলে লেনিন তাদের কিছু লাভের সুযোগ দিলেন। সেই লাভের আশায় তারাও নতুন উদ্যমে কাজে লাগল। আস্তে আস্তে আবার গ্রামে আর শহরে সকলে কাজ আরম্ভ করল। একে বলে নব-অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা (New Economic Policy কিংবা NEP)। তাদের তখনকার সমস্যা হল এই এতবড় সোভিয়েট দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা।

দেশের উন্নতি করতে গেলে চাই কলকারখানা। এখন সোভিয়েটে কলকারখানা কিছুই ছিল না। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা এ সব দেশ থেকেই তো যন্ত্রপাতি আনাতে হবে! অন্যদেশ হলে হয়ত সে সব যন্ত্রপাতি 'ধারে' পেত। কিন্তু তারা সোভিয়েটকে কেন ধার দেবে? সোভিয়েট বাঁচে এটা তারা চায় না। তারা সোভিয়েটকে আরো উল্টা চাপ দিল যে জারের আমলে তারা যে টাকা জারকে ধার দিয়েছিল তা না দিলে চলবে না! ইংল্যাণ্ড এমনি করে ৮৪,০০,০০,০০০ পাউণ্ড দাবী করল। রাশিয়াই বা ছেড়ে কথা

কইবে কেন? ইংল্যাণ্ড তাদের কত ক্ষতি করেছে যুদ্ধ বিগ্রহ করে! তারা বলল আগে তুমি আমাদের ক্ষতি পূরণ কর তারপরে আমরা তোমার টাকা দেব! তাদের দাবী হল ২,০০,০০০০০০০ পাউণ্ড। সে দাবীর কথা শুনেই ইংল্যাণ্ড চুপ করে গেল। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় তাদের আগে একবার এমনি দাবী পূরণ করতে হয়েছিল কিনা তাই তারা আর উচ্চ বাচ্য করল না।

সোভিয়েট তখন থেকে খুব ভাল লাভের আশা দেখিয়ে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার বড় বড় যন্ত্রপাতির কোম্পানীর সঙ্গে কাজ করতে চাইল। রাশিয়ার মত এতবড় দেশে ব্যবসা করার লোভ কি কেউ সামলাতে পারে। তাই গুটিগুটি দুটি একটি করে সব দেশেরই লোক রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করতে লাগল। শুধু আমেরিকা ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত রাশিয়ার সঙ্গে সরকারী ভাবে কোন সম্বন্ধ রাখে নি।

সোভিয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গেই লেনিন চেয়েছিলেন যে সমস্ত রাশিয়াময় বিদ্যুৎ দিয়ে যন্ত্রপাতি চালানো হবে। তাহলে মস্ত বড় বড় কলকারখানা করা যাবে—আর দেশের লোকের অভাব অনটন তাড়াতাড়ি মেটানো সম্ভব হবে। এমন কি দূর দূরান্তর গ্রামেও লেনিন বৈদ্যুতিক শক্তির প্রচলন করলেন। সমস্ত সোভিয়েটের লোক সেজন্য বিজলী বাতিকে বলত "লেনিনের বাতি"।

বৈদ্যুতিক শক্তির ওপর লেনিনের এত আকর্ষণ সম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে। এইচ, জি, ওয়েল্‌স হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের খুব নামকরা সাহিত্যিক। সোভিয়েট বিপ্লবের পর তিনি ১৯২১ সালে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে যান। লেনিন থাকতেন খুব সাধাসিধে ভাবে। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে রাশিয়ার ভবিষ্যতের কথা বললেন। ওয়েল্‌স সেগুলো শুনে দেশে ফিরে এসে হেসেই অস্থির। লোকজনকে বললেন—তোমরা খালি খালি লেনিনকে করিৎ-কর্ম্মা লোক বল; আমি তো দেখলাম লোকটা আস্ত পাগল। সে বলে কিনা রাশিয়াকে দশ বছরের মধ্যেই বিজলীর দেশ করে ফেলবে। রাশিয়াতে আছে কি? কেউ লেখাপড়া জানে, না তাদের যন্ত্রপাতি কিছু আছে? তেলের বাতিই যেখানে জ্বলে না সেখানে বিজলী বাতি!

এখন তো তোমাদের বলা উচিত কে পাগল, লেনিন না ওয়েল্‌স? লেনিন তাঁর কথা রেখেছিলেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য স্ট্যালিন অক্ষরে অক্ষরে সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছেন। সোভিয়েটে এখন বেশীর ভাগ কাজই হয় বিজলীর সাহায্যে।

তবে পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে লেনিন সে আশা সফল হওয়া দেখে যেতে পারেন নি। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়। সমস্ত রাশিয়ার লোক পাগল হয় লেনিনের

শোকে। লক্ষ লক্ষ লোক ছুটে এল লেনিনের মৃতদেহ দেখতে। সোভিয়েটের বিজ্ঞানীরা একরকম ওষুধের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন লেনিনের দেহ। আজও তা নষ্ট হয় নি। লাল স্কোয়ারের পাশেই রাখা আছে সে মৃতদেহ।

কিসের তরে লড়ল তারা

এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যে সোভিয়েটের লোকেরা ঘরোয়াযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের ভেতরও নিজেদের স্বাধীনতার পতাকা উঁচু রাখতে পেরেছিল সে কেন? কিসের মোহ ছিল তাদের? সে ছিল সাম্যবাদের হাতছানি! দেশের সকলে যাতে ভালভাবে জীবন কাটাতে পারে, গরীব বড়লোক কেউ থাকবে না—সেজন্যই এত চেষ্টা।

তাই গরীব চাষী মজুররা রাজত্ব দখল করেই বলল যে এটা এখন থেকে হল চাষী মজুরদের রাজত্ব। রাজত্ব চালাতে গেলেই দরকার রাজ্যশাসনের বাঁধাধরা নিয়ম কানুন। তাকে বলে 'গঠনতন্ত্র'—ইংরাজীতে "কনস্টিট্যুশন"। লেনিনের নেতৃত্বে চাষী মজুররাও এক নতুন 'গঠনতন্ত্র' তৈরী করল নিজেদের জন্যে!

এতে আগের যুগের রুশ সাম্রাজ্য নাম তুলে দেওয়া হল। সোভিয়েটের কথা তো আগেই বলেছি। সোভিয়েটকে নিয়েই দেশের নতুন নাম হল—সংঘ সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক

সাধারণতন্ত্র। ইংরাজীতে একে বলে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্, সংক্ষেপে ইউ, এস, এস, আর।

প্রথমেই নাও নামটা! সাধারণ লোক সমাজতন্ত্র আদর্শের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে সোভিয়েট ব্যবস্থার সাহায্যে দেশ শাসন করবে। কেমন এক কথায় সে দেশের আশা আকাঙ্খার কথা বলা হল! আগে জারের আমলে এসব প্রদেশের সাধারণ লোকের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা ছিল না। জোর করে তাদের ওপর অত্যাচার করত জারের লোক!

সোভিয়েট সংঘে প্রথমে ছিল চারিটি প্রদেশ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল রাশিয়া। রাশিয়া মানে কিন্তু শুধু ইওরোপের বুকের একটা প্রদেশ—এর কথা তো তোমরা আগে পেয়েছো। তারপরে হল ককেশাসের পারের দেশ, ইউক্রেন আর শ্বেত রাশিয়া। আর কিছুদিন পরে উজবেক, তাজিক ও তুর্কমেন প্রদেশও যোগ দেয় এই সমাজতান্ত্রিক সংঘে।

১৯২২ সালে জাপানকে তাড়াবার পর প্রথম এই রাষ্ট্র সংঘের অধিবেশন হয়। তখনই আইন করে ঠিক করা হয়, কতগুলো স্বাধীন সাধারণতন্ত্র এক হয়ে এই রাষ্ট্র সংঘ গড়বে। অন্য যে কোনও সাধারণতন্ত্র এতে যোগ দিতে পারে। সে জন্যেই তো প্রথমে চারটি হলেও আজ বহুজাতি যোগ দিয়েছে এই সংঘে। এই সেদিন জার্ম্মান যুদ্ধের মধ্যে যোগ দিল চারিটি দেশ।

পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে কিন্তু এমন নিয়ম নেই। আমেরিকাতেও রাষ্ট্রসংঘ আছে। কিন্তু তাতে যে ছোট ছোট প্রদেশ যোগ দিয়েছে তারা পুরোদস্তুর স্বাধীন নয় কেউ। ইচ্ছে করলেই যে কেউ সংঘ থেকে বেরিয়ে যাবে তার উপায় নেই। তা ছাড়া সে-সব রাজ্যে সাধারণ লোকের মতামতের কোন দামই নেই।

সোভিয়েট তো সাধারণেরই দেশ তাই সেখানে যারা এসে যোগ দিয়েছিল তারা যদি ভাল মনে করে তবে ইচ্ছে করলে যে কোন সময়েই সংঘ ছেড়ে যেতে পারে। সোভিয়েট সকলের ভাল চায় বলেই তারা সংঘ ছেড়ে যাবার কথা কেউ ভাবতে পারে না।

আলাদা আলাদা প্রদেশগুলোর নিজের ইচ্ছেমত শাসন করবার অধিকার আছে। কিন্তু অনেকগুলো প্রদেশ মিলে সংঘ তৈরী হয়েছে। সেখানে সাধারণের স্বার্থ দেখে চলতে হবে তো। তাই সংঘের কাজ হচ্ছে সাধারণ ভাবে এই বিরাট দেশের সকলের স্বার্থ সমান ভাবে দেখা। তার রাজধানী হচ্ছে মস্কৌ।

এখন সোভিয়েট সংঘের সভ্য হচ্ছে ১৬টি বড় সংঘ সাধারণতন্ত্র। তা ছাড়া আরও ২২টি আছে স্বায়ত্ব শাসিত সাধারণতন্ত্র। এসব সাধারণতন্ত্রের মধ্যেও আবার আছে স্বায়ত্ত শাসিত প্রদেশ ও বিভিন্ন জাতির এলাকা।

সোভিয়েটের নেতারা কাউকেই জোর করে অধীনে রাখতে

চান না। এখন এত বড় সোভিয়েট দেশে যে বহু জাতির লোক বাস করে তার কথা তোমরা আগেই শুনেছো। এমন সব জাতি আছে সেদেশে তখনো যাদের কোন লেখবার ভাষা ছিল না। অনেক পিছিয়ে পড়া জায়গায় এক ধর্ম্মের লোক সব একভাবে থাকতে চায়। তাদের স্বাধীনতা যাতে না নষ্ট হয় সেজন্যেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির এলাকা ঠিক করা হয়েছে। নিজেদের সব ব্যাপারেই তারা স্বাধীন। কাস্পিয়ান সাগরের পারে ছোট আজারিস্থান হচ্ছে মুসলমানদের এমনি এক এলাকা। বিরো বিজান হচ্ছে তেমনি ইহুদীদের।

এত সব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে তাদের নিজের ভালমন্দের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে সব দেশের প্রতিনিধিরা মিলে সভা করে মস্কৌতে। তাকে বলে "জাতীয় সোভিয়েট" বা "সোভিয়েট অফ ন্যাশনালিটিজ"। এতে প্রায় ৬০০ জন সভ্য। তাছাড়া সমস্ত সোভিয়েট দেশ থেকেই ১৮ বছরের বেশী বয়স হলেই ছেলে মেয়েরা ভোট দিতে পারে। তারাও নিজেদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। তাদের পরিষদের নাম "সংঘ সোভিয়েট" ইংরাজীতে "সোভিয়েট অফ দি ইউনিয়ন"। এতে থাকে ৫৭৫ জন প্রতিনিধি। জাতীয় ও সংঘ সোভিয়েট দুটি মিলিয়ে সোভিয়েট দেশের শাসন চালায়। তাকে বলে "সুপ্রীম সোভিয়েট"। বছরে দুবার করে এই সুপ্রীম সোভি-য়েটের বৈঠক বসে। আর ৪ বছর পরপর নতুন সোভিয়েট নির্ব্বাচিত হয়। এখানকার সভ্যরা সবাই দেশ বিদেশ থেকে

আসে। কেউ মনে কর আসছে দূর সাইবেরিয়ার এক কোণা থেকে—শীতের পোশাকে তাকে ভালুকের মত দেখাচ্ছে। আবার কেউ আসছে মরুভূমি থেকে—রোদে-পোড়া চেহারা। বরফের রাজ্য সুমেরু থেকে এল হয়ত নেণ্টসীরা! মস্কোর তখন যা বাহার খোলে! রাস্তায় ঘাটে জামা-কাপড়ের রং-এর জোয়ার আসে যেন! সবাই হাসিখুশি! তাদের সবাইকারই দেশে নানা কাজ কর্ম্ম থাকে বলে সুপ্রীম সোভিয়েটে বেশী দিন থাকতে পারে না। সুপ্রীম সোভিয়েট তাই খুব কম দিনের জন্যে বসে।

সুপ্রীম সোভিয়েট যখন বন্ধ থাকে তখন শাসন চালায় "কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশার"। সুপ্রীম সোভিয়েট থেকে লোক নিয়েই এটা নির্ব্বাচিত। অন্যদেশের মন্ত্রীসভার মত হল আর কি!

সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতি হচ্ছেন কালিনিন; কাউন্সিল অফ পিপলস্ কমিশারের সভাপতি স্ট্যালিন; সহকারী সভাপতি আর বৈদেশিক মন্ত্রী হচ্ছেন মলোটভ।

এতক্ষণ কথা হল সোভিয়েট সংঘ নিয়ে। এবার শোন গঠনতন্ত্রের কথা। সোভিয়েটের প্রথম গঠনতন্ত্র রচনা হয় ১৯১৮ সালের দুর্যোগের মধ্যে! তাতে যারা বিপ্লবের বিরোধীতা করেছিল তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। কিন্তু সোভিয়েটের শিক্ষার ফলে খুব তাড়াতাড়ি দেশের উন্নতি হয়। তখন ১৯৩৬ সালে এক নতুন

গঠনতন্ত্র রচনা হয়। স্ট্যালিনের প্রেরণাতেই হয়েছিল বলে অনেকে একে "স্ট্যালিন গঠনতন্ত্র"ও বলে।

গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে গোড়ার কথাগুলো থেকেই বুঝতে পারবে সোভিয়েটের উদ্দেশ্য! প্রথম ধারায় বলা হচ্ছে—সংঘ সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হচ্ছে মজুর চাষীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র! তার মানে আগেই বলেছি তোমাদের। আর কোনও দেশের গঠনতন্ত্রে এমন কথা পাবে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে হলে চাই সমাজ থেকে শোষণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া। এদিকে গরীব বড়লোক থাকবে আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নাম দেব তা হতে পারে না। তাই কয়েকটি ধারায় বলা হয়েছে যে দেশ থেকে ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল। সোভিয়েট দেশে কেউ অন্যকে খাটিয়ে নিজে লাভ করতে পারবে না। দেশের যত জমিজমা বনজঙ্গল, কলকারখানা রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, সরকারী চাষের খামার সব কিছুই হচ্ছে জনসাধারণের (প্রপার্টি অফ দি হোল্ পিপল্)।

এছাড়া যত পঞ্চায়েতী খামার হয়েছে তার জমিজায়গা সব চিরদিনের জন্যে তাদের দেওয়া হয়েছে।

যার যা নিজের জিনিস-পত্তর আছে তাতে অন্যে হাত দিতে পারবে না। আর একটা কথা! সোভিয়েট দেশ হচ্ছে সকলের জন্যে! সেখানে একজন বেশী খাটবে আর একজন বসে থাকবে তা চলবে না। সাধ্যমত সবাইকেই

খাটতে হবে। গঠনতন্ত্রের বারো ধারায় সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—“যে খাটবে না সে খেতেও পাবে না!” আর যে যেমন কাজ করবে সে তেমনি প্রতিদান পাবে। অর্থাৎ যারা ভাল কাজ করবে তারা অন্যের চেয়ে বেশী রোজগার করতে পারবে।

রোজগারের কথা উঠলেই মনে হয় যে সবাই কি রোজগার করতে পারবে? আমাদের দেশে তো কত লক্ষ লক্ষ লোক থাকে বেকার। সোভিয়েটের গঠনতন্ত্রের ১১৮ ধারায় তাই বলা হয়েছে যে সোভিয়েট দেশের প্রত্যেক লোকেরই কাজ করবার অধিকার আছে। শুধু কাজই নয়, কাজ অনুপাতে তারা রোজগারও করতে পারবে। দেশের কল-কারখানা বাড়িয়ে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে বেকার সমস্যা দূর করে তাদের কাজের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শুধু কাজ করলেই চলবে না। মানুষ যদি যন্ত্রের মত দিনরাত কাজই করে যায়—তা হলে সে মানুষ নামের যোগ্য হবে কেন? তাই ১১৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, সোভিয়েটের প্রত্যেক লোকেরই কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম করবারও দাবী আছে। সে যেমন কাজ করবে তেমনি সরকার থেকে তাকে নিয়ম মত ছুটি দিতে হবে। দেশের লোক যাতে মনের আনন্দে ছুটি কাটাতে পারে, সে জন্যে ভাল ভাল জায়গায় স্বাস্থ্যনিবাস তৈরী করা হবে তাদের জন্যে!

একটু আগেই বলেছি যে সোভিয়েটের গঠনতন্ত্রে আছে যে না খাটলে খাবারও মিলবে না কারুর। তা থেকে ভাবতে পারো যে বুড়ো কি বিকলাঙ্গ কি অন্য কারণে হঠাৎ কেউ অপারগ হলে কি করবে। তারও বন্দোবস্ত সোভিয়েটে করা হয়েছে ভাল ভাবে। ১২০ ধারায় আছে যে, এদের সকলের জন্যে সরকার থেকে পেন্সন দেওয়া হবে। যতদিন বাঁচবে ততদিন তাদের খরচ সরকার দেবে।

রাজ্য চালাতে গেলে শিক্ষিত লোক না হলে চলবে না। আমাদের দেশে ক'জনই বা লিখতে পড়তে জানে? সোভিয়েটের ১২১ ধারায় আছে যে, সরকার থেকে বিনা খরচে দেশের সবাইকে শিক্ষা দেবে। কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।

এখানে মেয়ে পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার। কেউ বড় কেউ ছোট নয়। ১২২ ধারায় সে কথা বলা হয়েছে।

দেশের লোকের কিসে সুবিধে হবে—তার যত রকমের বন্দোবস্ত করা দরকার তা সোভিয়েট থেকে পূরণ করা হয়! কাজেই যে সরকার থেকে তাদের জন্য এত ভাল বন্দোবস্ত করা হয়েছে—তার জন্যে কেন লোক প্রাণ দেবে না? যারা গরীব চাষী মজুর—তারা চাইবে সোভিয়েটের মত রাজত্ব। আর যারা গরীবের ওপর অত্যাচার করতে চায়—তারা চাইবে সোভিয়েটের ধ্বংস!

দেশদ্রোহী ছিল যারা

বিপ্লব হল, চাষী মজুরের রাজত্ব শুরু হল আর মানুষের ওপর থেকে মানুষের অত্যাচার পেল লোপ।

কিন্তু বিপ্লবের গোড়াতে যেমন যুদ্ধ করতে হয়েছিল সব শত্রুর সঙ্গে—তেমনি বিপ্লব সফল হবার পরও একদল স্বার্থপর নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের লড়াই করতে হয়েছিল।

বিপ্লবের উত্তেজনায় এঁরা অনেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজে পান নি। চাষী মজুরের বিপ্লব বলে চ্যাঁচালেও এঁরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন না যে কখনো গরীব চাষী আর মজুর ভালভাবে দেশ শাসন করতে পারবে। তাঁরা চাইতেন যে, একবার কোনও রকমে বিপ্লবের হৈচৈ-র ভেতর দেশের নেতা হয়ে বসতে পারলেই—ব্যস্। তারপর নিজেদের খুশিমত দেশ শাসন করা যাবে। এমনি ভণ্ড নেতাদের মধ্যে ট্রট্স্কী, জিনোভিভ, কামেনেভ, রাডেক্, বুখারিনই খুব বিখ্যাত। দেশবিদেশে এঁদেরই নাম ছড়িয়ে পড়েছে বেশী। বাইরের কেউ কেউ মনে করেন যে, লেনিনের চেয়ে ট্রট্স্কী

সোভিয়েট বিপ্লবের বড় নেতা। এগুলো কিন্তু সব ভুল ধারণা।

বিপ্লবের হৈ চৈ কমে গেলে রাশিয়ার সত্যিকার চেহারা হল ভয়াবহ। রাশিয়ার সেই রূপ দেখে এঁরা ঘাবড়ে গেলেন। ক্ষত বিক্ষত রাশিয়াকে যে আবার গড়ে তোলা যেতে পারে এ হল তাঁদের স্বপ্নের অতীত ভাবনা! এঁদের মনে তখন ভয় হল যে হয়তো সোভিয়েট রাজত্ব আর চালান যাবে না। তার চেয়ে বড়লোকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কোন নতুন উপায়ে দেশ শাসন করা ভাল। বিপ্লবের যখন জয় হবে ঠিক তখনি বিপ্লবের এই সব নেতারা গেলেন ভয় পেয়ে পিছিয়ে। এঁরা তখন পদে পদে বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা দিতে লাগলেন।

বিপ্লবের সময় অবশ্যি এঁরা অনেক ভাল কাজ করে-ছিলেন; তবে প্রায় সবাই বলশেভিক পার্টিতে খুব অল্পদিন আগে ঢুকেছিলেন। নিজেদের স্বার্থমত চলতে পারবেন না বলেই এঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে আগে যোগ দেন নাই।

এদের মধ্যে জিনোভিভ, কামেনেভ বিপ্লবের আগে থেকেই বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করতেন। কবে বিপ্লব করা হবে তার দিনক্ষণ খুব গোপনে রাখতে হয়। শুধু মাত্র নেতারা নিজেই সে খবর রাখেন। নভেম্বর বিপ্লবের দিনও তেমনি করে গোপন রাখার কথা। কিন্তু জিনোভিভ-সে খবর আগেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তাতে

ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিনোভিভ ক্ষমা চেয়ে আবার দলে ঢুকেছিলেন। কিন্তু নিজের স্বভাব ছাড়তে পারেন নি। অবশেষে শ্রেষ্ঠ বল-শেভিক কিরভ হত্যার চক্রান্তে জড়িত হওয়ায় তাঁকে ফাসী দেওয়া হয়।

ট্রট্স্কীর ইতিহাসও তাই। লেনিনের সঙ্গে পরিচয় হবার সময় তিনি অন্যদলে ছিলেন। তারপরে লেনিনের প্রভাবে বলশেভিক দলে ঢোকেন। বক্তৃতার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। সেজন্যে বিপ্লবের সময় তাঁকে দিয়ে অনেক ভাল কাজ হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ভয়ানক উচ্চাভিলাষী! নিজের মতকেই সবচেয়ে উচ্চ স্থান দিতেন বলে অনেক সময়েই ভুল করতেন। লালফৌজ গঠনের সময় তাঁর যে নানা ভুল হয়েছিল সে সব আগেই বলেছি।

এসব ছাড়াও তাঁর অনেক দোষ ত্রুটি ছিল। তিনি সব সময়ই নিজেকে লেনিনের চেয়ে ভাল মার্ক্সবাদী বলে মনে করতেন আর ভুল পথে রাশিয়াকে চালাতে চাইতেন। সোভিয়েট বিপ্লব সম্বন্ধেও তিনি লেনিনের মত মানতেন না। লেনিন নিজের দেশের লোকের শক্তি সামর্থ্যের উপর ভরসা রাখতেন। তিনি বলতেন যে, কোনদেশে আগে বিপ্লব হবে আর কোনদেশে পরে, তার কখনো কোনও বাঁধাধরা নিয়ম থাকতে পারে না। অনেকে বলেন যে দেশে কলকারখানা যত বেশী সে দেশেই তত আগে চাষীমজুরের বিপ্লব হবে। একথাও

লেনিনের মতে ভুল। তিনি বলতেন যে রাশিয়াতে কলকারখানা বেশী না থাকলেও—সেদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। চাষীমজুর যদি বড়লোকদের ধ্বংস করে রাজ্য কেড়ে নিতে পারে তাহলেই তো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করা হল। কিন্তু সে বিপ্লব সফল করতে হলে গরীব চাষী, মধ্যবিত্ত আর মজুরদের সবাইকে নিয়ে একটা দল গড়ে তুলতে হবে! তারাই হবে বিপ্লবের নেতা।

ট্রট্স্কী বলতেন ভিন্ন কথা। তিনি বলতেন যে সোভিয়েটে বিপ্লব করতে গেলে মজুরদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সত্যিকারের বিপ্লব করতে হলে মজুররাই করবে চাষীদের ওপর কর্তৃত্ব। সমাজতন্ত্রবাদ হচ্ছে মজুরেরই রাজত্ব! তবে চাষীদের সাহায্যে মজুরদের প্রথমে বিপ্লব করতে হয় বলে পরে তাদের দাবিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠে। রাশিয়ার গরীব চাষীদের দমন করা কঠিন হবে বলেই তিনি বলেন যে শুধু এক রাশিয়াতেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যখন মজুররা বিপ্লব করবে তখনই রাশিয়ার মজুররা তাদের সাহায্যে চাষীদের দাবিয়ে সত্যিকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

কাজেই দেখছো বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিন আর ট্রট্স্কীর ধারণার কত পার্থক্য! সোভিয়েটে যে চাষীমজুরের মিলনের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব একথা পদে পদে লেনিন তাঁকে বোঝালেও তিনি থামেন নি। এছাড়া আরও অনেক

দোষত্রুটি ছিল তাঁর! সেজন্যে বাধ্য হয়ে সোভিয়েট সরকার তাঁকে নির্ব্বাসিত করেছিল। রাডেক, কামেনেভ, বুখারিনও তখন থেকেই সোভিয়েট বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেগেছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর যে কোন নূতন কাজ করা হত এঁরা তাতেই বাধা দিতেন।

বুখারিনকে লোকে আগে জানত খুব চিন্তাশীল দার্শনিক বলে। তাঁর লেখা বই সোভিয়েটের ছাত্ররা খুব মন দিয়ে পড়ত। অথচ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সেই বুখারিনই নানা ভাবে তাতে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে রাশিয়াতে এত তাড়াতাড়ি কলকারখানা করা উচিত নয়।

শুধু তাই নয়। বিদেশী যে সব কোম্পানীকে রাশিয়ায় ব্যবসা করতে সুবিধে দেওয়া হয়েছিল এই সব দেশ-দ্রোহীরা যোগ দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে। সোভিয়েটে তখন সবাই এগিয়ে চলেছে রুদ্ধশ্বাসে। আর এসব কোম্পানীগুলো তখন এমন ভাবে কারখানা চালাতো যেন তাতে বেশী কাজ না হতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় এরা কলকারখানা নষ্ট করেও ফেলত। চাষীদের সবাইকে মিলিয়ে যখন পঞ্চায়েতী খামার করা হত তখন এই সব নেতারা চাষীদের তাতে যোগ দিতে বারণ করতেন!

দেশের বেশীর ভাগ লোক কিন্তু আর ঐ সব নেতার কথা শুনত না! বলশেভিক পার্টির কথাই ছিল তাদের কাছে

বেদবাক্য। লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্ট তখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের বোঝাত।

ক্রমে বুখারিন আর সবাই বুঝতে পারলেন যে দেশের মধ্যে থেকে বিপ্লবের বিরোধিতা করে লাভ নেই। তখন তাঁরা হিটলার আর জাপানের সঙ্গে চক্রান্ত আরম্ভ করলেন। স্টালিনকে হত্যার চক্রান্তও হয়েছিল। সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ লেখক গর্কীকে এঁরা অমানুষিক ভাবে খুন করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে এঁদের চক্রান্ত প্রকাশ পায়। মস্কোতে বিচারে দোষ প্রমাণ হওয়ায় এঁদের ফাঁসী দেওয়া হয়।

তাঁদের ফাঁসীর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটের দেশদ্রোহীদের শেষ দল ধ্বংস হয়ে যায়। এর কিছু পরেই হিটলার ১৯৪১ সালে রাশিয়া আক্রমণ করেন। তখন আর তাঁকে সাহায্য করবার কেউ ছিল না সোভিয়েটে। ইউরোপের অন্য যত দেশ হিটলার দখল করেছিলেন তাতে দেশদ্রোহীরাই তাঁকে সাহায্য করেছিল বেশী। সোভিয়েটে আর তাঁর সে চালাকি খাটে নি। তাই আজ সোভিয়েটের কাছে জার্মানীকে পরাজিত হতে হয়েছে।

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা

সোভিয়েট হচ্ছে সমাজতন্ত্রের দেশ; মানে এদেশে চাষী মজুরাই হচ্ছে সমাজের কর্ত্তা। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সবাইকার ভাল খাবার পরবার বন্দোবস্ত করা। এখন এত বড় দেশে তো হুট বলতেই আর সব কাজ হয় না। সময় লাগে প্রত্যেক কাজে! সেজন্যে এদেশে দরকার হচ্ছে খুব ভেবে চিন্তে হিসেব নিকেশ করে সব কাজে হাত দেওয়া। গরীবরাই হচ্ছে কোটি কোটি; তাদের কোন জিনিস আগে দরকার সেটা জানতে হবে। অন্য পাঁচটা কাজ ফেলে রেখেও সে কাজ সারতে হবে প্রথমে। বড় বড় লোহা লক্করের কলকারখানা করতে দেখলে হয়ত মনে হতে পারে যে এগুলোর এখুনি তেমন কি দরকার। কিন্তু ঐসব কারখানা থেকে হবে হরেক রকম যন্ত্রপাতি; তা দিয়ে আবার হবে অন্য জিনিসের কারখানা। তখন আরও অনেক দরকারী জিনিস তৈরী হবে দেশে। কোনটা আগে আর কোনটা পরে কি ভাবে করতে হবে এতসব

হিসেব নিকেশ করে যে কাজের ছক তৈরী করা হয় তাকেই বলে পরিকল্পনা।

যে-সব দেশে বড় লোকরা কর্ত্তা তাহাদের ওখানে এত হিসেব নিকেশের দরকার করে না। যার যা ইচ্ছে সে তাই তৈরী করে। তারা তো সমাজের সকলের ভাল হবে বলে কোন কাজ করে না। তারা চায় কোনও রকমে জিনিস বিক্রী করে লাভ করতে।

সমাজতান্ত্রিক দেশের কলকারখানা সব গরীবদের হাতে। মজুররাই সব কর্ত্তা। কাজেই তাদের কাছে লাভের কোন বালাই নেই। সমাজের সকলেরই ভাল চায় বলে তাদের একেবারে পাকা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ না করলে চলে না।

১৯২১ সালে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাশিয়ার অবস্থা হয়েছিল ভয়ানক শোচনীয়। সেজন্য লেনিন নেপনীতির প্রচার করেছিলেন। নেপনীতির জন্যে ধীরে ধীরে রাশিয়ার অবস্থা ভালর দিকে ফিরে আসছিল। তারও আগে খ্রীশানোভস্কী নামে এক ইঞ্জিনীয়ারের সাহায্যে লেনিন রাশিয়াময় বিদ্যুত সরবরাহের মতলব করেছিলেন। সেই পরিকল্পনাকে সংক্ষেপে রাশিয়ানরা বলত "গোয়েলরো" (Goelro)। পরে এই গোয়েলরোকেই বাড়িয়ে সরকার থেকে নতুন পরিকল্পনার দপ্তর তৈরী করে নিয়েছিল। তার নাম হয়েছিল গসপ্লান (Gosplan)। এরও কর্ত্তা ছিলেন খ্রীশানোভস্কী। সারা রাশিয়াময় ছড়িয়ে ছিল এর শাখা প্রশাখা। এদের কাজ ছিল

ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ফসল বা কলকারখানায় কত জিনিস পত্তর তৈরী হচ্ছে গসপ্লানের দপ্তরে তার ঠিক ঠিক হিসেব যোগানো।

কলকারখানার হিসেব যোগানো সহজ। কোন কলে কি কাজ হয়, কতটা জিনিস তৈরী হয় একথা সব ম্যানেজারই বলতে পারে। কিন্তু মুস্কিল হল চাষীদের নিয়ে। তারা যে কে কোথায় কতটা ফসল তুলল তার হিসেব পাওয়া কঠিন। আবার নেপনীতির ফলে জোতদাররাও নিজেরা ফসল কিনে বস্তাবন্দী করে রেখে পরে বেশী দামে বিক্রি করে দুপসা লাভ করত গরীবদের ঘাড় ভেঙে।

তার ফলে গরীবদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। বিপ্লবের পর রাজা রাজরার জমি সব গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। কারুর একার ভাগেই সেজন্যে বেশী জমি পড়ে নি। ছোট এক ফালি জমিতে কখনও ভাল ফসল ফলতে পারে না। তাই একদিকে চাষীদের ফসল হল কম আর জোতদাররাও তাদের মনে ফসল চালান করতে লাগল। এতে সোভিয়েটের হিসেব নিকেশ গুলিয়ে গেল। সোভিয়েটের নেতারা গরীব চাষীদের তখন বোঝাতে লাগলেন যে নিজে নিজে আলাদা চাষবাস না করে যদি কয়েক জন মিলে এক সঙ্গে চাষ করে তাহলে সরকার থেকে তাদের যন্ত্রপাতি আর অন্য অনেক জিনিস দিয়ে সাহায্য করবে। আর সে ভাবে চাষ করলে ফসলও বেশী হবে। তাতে তাদেরও লাভ থাকবে অনেক বেশী। কি করে যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষবাস করতে হবে তা

শেখাবার জন্যে সোভিয়েট থেকে সাধ্যমত সরকারী খামার গড়ে তুলেও অন্যদের শিক্ষা দেওয়া হত।

গ্রামের চাষীদের অবস্থা খারাপ রেখে শহরের মজুরদের অবস্থা ভাল করলে চলবে না তাই বলে। গ্রাম আর শহর দুই-এরই অবস্থা ভাল করা চাই। আবার মজার কথা হচ্ছে যে, চাষীর অবস্থা ভাল হলে শহরের অবস্থাও ভাল হয় অনেক সময়। চাষবাসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গসপ্লানের কাজও অনেক সহজ হয়ে এল।

প্রথম প্রথম জ্বালানি, যানবাহন, খাবার আর বিদেশী বানিজ্য নিয়ে টুকিটাকা কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল। তারপর ১৯২৮ সালে পাকাপোক্ত ভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নেওয়া হয় সোভিয়েটে। হাজার হাজার বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনীয়ার মিলে সমস্ত দেশের কোথায় কি হতে পারে তার খোঁজ করেন। নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করার পরে তবে একটা কাজের ছক করা হয়। বড় কারখানা করলেই তো হবে না, তাকে চালাবার মত তেমনি ভুরি ভুরি কাঁচামাল চাই, জ্বালানি চাই। কাঁচামাল টেনে আনবার মত যানবাহনের বন্দোবস্ত না করলে আবার কারখানাই চলবে না। বিজলী দিয়ে যদি কারখানা চালানো হয় তাহলে কোন নদী বা জলপ্রপাত থেকে বাঁধ দিয়ে বিজলী শক্তি যোগাড় করতে হবে। কারখানা যদি বা হয় তা চালাবে কারা? সেজন্যে দরকার ওস্তাদ মিস্ত্রি আর ইঞ্জিনিয়ারের।

কাজেই দেশ জুড়ে মিস্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানীর হিসাব নিয়ে ঠিক করা হয় কটা কারখানা করা হবে নতুন করে। কারখানা থেকে জিনিস বানান হলেই হল না। জিনিস বিক্রীর দামও সরকার থেকে বেঁধে দেওয়া হয়। নয়ত দাম বেশী হলে গরীবরা কিনবে কি করে সে সব জিনিসপত্তর ?

এ কাজের ছকে কোথাও একটুকু ভুলচুক হলে আর রক্ষে নেই। সেজন্য খুব সাবধানে এ ছক তৈরী করা হয়। প্রথমে গসপ্লান থেকে তৈরী করা হয় এক গাদা প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের নকল পাঠানো হয় সারা দেশের কলকারখানায়। কল-কারখানার মজুর আর ম্যানেজারেরা তখন সেই খসড়া নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের মতামত পাঠায় ওপরওয়ালার কাছে। গ্রামে গ্রামেও চাষীরা মিলে প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে নিজেদের যা বলবার আছে তা বলে পাঠায় ওপরে। সেই সব মতামত সুদ্ধ গসপ্লানের কাছে সেই প্রথম খসড়া ফিরে আসে। সেগুলো বিচার করার পর গসপ্লানের কর্ত্তারা বসে পাকাপাকি পরিকল্পনা নেন। সেটাই হল সরকারী পরিকল্পনা।

ছোট একটা শহরের কাজের ছকের গল্প শোনো তাহলেই বুঝতে পারবে সব কিছু।

ক্ভালিঙ্ক হচ্ছে সোভিয়েটের এক ছোট্ট শহর। এখানকার সোভিয়েটের কর্ত্তার নাম ভিদেমস্কী। প্রায় সারারাত জেগে তিনি গাদা গাদা কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছিলেন। তখন একজন বিদেশী পর্য্যটক তাঁকে বলেন

"কি মশায়, এইটুকু তো আপনার শহর। তার আবার এত কি কাজ থাকতে পারে যে রাতজেগে খাটছেন?"

ভদ্রলোক তো চটেই আগুন। তিনি বললেন হুঁ ছোট শহর তো বটেই কিন্তু এই ছোট শহরেরই মাথায় আছে বিরাট কাজের দায়িত্ব। গসপ্লানে সুবিধে দিলে আমরা যে আরও কত কাজ করতে পারি তা কি বলব আপনাকে!" ভদ্রলোক ছিলেন আমেরিকান। তাঁকে লক্ষ্য করেই সেজন্যে ভিদেমস্কী বললেন "এভাবে আমরা সবাই কাজ করলে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যেতে আমাদের বেশী দেরী হবে না। এবারকার খবর রাখেন কিছু? আমাদের ফসল করার কথা ছিল প্রায় ৩৬০, ০০০ মন আর আমরা করেছি তাথেকেও ১০,০০০ মন বেশী!

"প্রথমে আমরা গসপ্লানের প্রশ্নের উত্তর দেই। একটা কাগজে এখানে কি কি হয় আর কি হতে পারে তার একটা ফিরিস্তি পাঠিয়ে দি। আর একটাতে দিই আমরা কি চাই তার লিষ্টি।

"লিষ্টগুলো আমরা ওপরওয়ালাদের কাছে পাঠাই। সেখানের কর্ত্তারা আমাদের চাহিদা আর কাজ নিয়ে অনেক আলোচনা করেন। আমরাও সেই আলোচনায় মতামত পাঠাই। তারপর সেগুলো ফেরৎ যায় গসপ্লানের কাছে। সমস্ত দেশ থেকে এমন লক্ষ লক্ষ ফিরিস্তী দেখে তবেই গসপ্লানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী হয়।"

এই ভাবে রচিত হয়েছিল ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।

পরের পাঁচবছর দেশের কলকারখানায় আর খেত খামারে কি কি জিনিস তৈরী হবে আর কতগুলো করেই বা হবে তার পুরো হিসাব নিকাশ আছে এতে। পাঁচবছরের খসড়ার ভেতরে থাকে আবার প্রত্যেক বছরের আলাদা আলাদা হিসেব। বছরের হিসেবগুলোও আবার ভাগ করা আছে ঠিক তিন মাসের মত করে। তিন মাসের যে ছক থাকে সেগুলোর মত কাজ হলে তবেই গিয়ে বছরের শেষে কাজের হিসাব মিলবে। আর নয়ত তিন মাসের যে কাজ করার কথা তা যদি না করা হয় তাহলে বছরের শেষে কাজের হিসেব মিলবে কেমন করে?

এক একটা পরিকল্পনার কাজের বহর শুনবে? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এগুলো ছিল ঃ

দেশজুড়ে নতুন রেল লাইন গড়ে তুলতে হবে প্রায় সাতহাজার মাইল। সে লাইনে বিজলীতে গাড়ী চালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। এত বিজলীর জন্যে বিরাট দৈত্যের মত পনেরোটা নতুন বিজলী প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। দেশে যত মোটর গাড়ী আছে তার আটগুন বেশী নতুন মোটর বানাতে হবে। কলের লাঙ্গলও বানাতে হবে চারগুন বেশী। এদেশের বাটা কোম্পানীর চেয়েও বড় বড় একুশটা জুতোর কারখানা করতে হবে। সে সব কারখানায় হবে বছরে দশ কোটি জোড়া জুতো। তেমনি বড় পশমের কারখানা হবে

বারোটা। পনেরোটা হবে কাপড়ের কল। এমনি আরও কত কি।

অবিশ্যি বাঁধা ধরা ছকের মতই যে কাজ হয় সব সময় তা নয়। নানা অঘটন ঘটতে পারে, হটাৎ বিপদ আপদ হতেই বা কতক্ষণ! তবে ভুলচুক হলেই চটকরে সেগুলো শুধরে নেওয়া হয়।

এত বড় বড় ব্যাপারের জন্য লোককে শেখাবারও ব্যবস্থা আছে ঐ পরিকল্পনাতেই। ৫০ লক্ষ লোককে ভাল করে কারিকরী শেখাতে হবে ঐ পাঁচ বছরের মধ্যে। যেখানে যেখানে কলকারখানা হবে সেখানে মজুরদের খাবার ঘর করা চাই, তাদের খেলার ক্লাব থাকবে, সিনেমা বায়স্কোপও করতে হবে তাদের জন্যে। যেমন খাটবে তারা তেমনি আমোদ আহ্লাদও তো চাই তাদের।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দায়িত্ব থাকে কারখানার কর্ত্তার ওপর। তবে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নও কাজের তদারক করে অনেক সময়। ম্যানেজার ভালমত কাজ না করলে মজুররা মিলে তাঁকে তাড়িয়ে দিতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন আর সরকারের কারখানার লোক মিলে মজুরদের মাহিনা ঠিক করে। প্রত্যেক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে একটা কারখানা সমিতি করা হয়। তারাই মজুরদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাচ্চাকাচ্চাদের দেখাশোনা করে। কারখানার মজুরদের জন্যে দেশের ভাল জায়গায় হাওয়া

বদলাবার বাড়ী ঘরও তৈরী করা হয়। শরীর খারাপ হলে মজুররা সেখানে বিনিপয়সায় বেড়াতে যায়।

যে যেমন কাজ করে তেমনি মাহিনা পায় সব মজুররা। কারখানায় কত কাজ হবে বছরের গোড়া থেকেই তা জানা থাকে। তৈরী জিনিসগুলোর দামও ঠিক করা হয় আগে থেকে। কতলোক মিলে সে জিনিসগুলো তৈরী করে, তার হিসেব ধরে তখন মজুরদের মাহিনা ঠিক করা হয়। যে ভাল কাজ করে সে পায় বেশী।

শহরের কারখানায় যেমন গ্রামের চাষীরা তেমনি সবাই মিলে খামারের সমিতি নির্ব্বাচন করে। তারাই চাষবাস সব কিছু দেখাশোনা করে। কারখানার মতই চাষীদের কাজদেখে তাদের মাহিনা দেওয়া হয়।

খামারের কাজ হয়ে গেলে চাষীরা নিজের নিজের জমিতে শাকশব্জীর বাগান করে। হাঁস মুরগী গরু শূয়োর সব কিছু তারা পালে। ছোটদের জন্যে কিণ্ডারগার্টেন, বড়দের স্কুল, থিয়েটার সিনেমা কোন কিছুই বাদ নেই গ্রামে।

বিপ্লবের আগে রাশিয়াতে বেশীর ভাগ লোক ছিল অশিক্ষিত। একশো জনের মধ্যে পঁচাত্তর জনই লিখতে পড়তে জানত না, আর মাস্টার পণ্ডিতদের দুর্দ্দশা দেখে সবাই করত সহানুভূতি। শহরে যদিও বা কচিৎ কদাচিৎ স্কুলের জন্যে বাড়ী থাকত গ্রামে আর সে সব কিছুরই বালাই ছিল না। পাঁচ ছ

মাইল দূরের ছাত্ররা সবাই এসে গাঁয়ের এক কোণে ভাঙা চোড়া ঘরে পড়াশুনা করত।

এত দুঃখকষ্টের ভেতর সবাইকে লেখাপড়া করতে হত যে, খুব কম লোকই সত্যিকারের শিক্ষা পেত। অবশ্য সেই দুঃখ কষ্টের ভেতরও দুচার জন খুব পণ্ডিত জন্মেছিলেন রাশিয়াতে। তাঁদের মধ্যে লোমোনোসভ, পাভলভ, মেণ্ডেলিভ আরও অনেকেরই নাম পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।

সোভিয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবস্থা ফিরে গেল। সোভিয়েট সরকার গোড়া থেকেই চেয়েছিল দেশের সবাইকে শিক্ষিত করতে। সেজন্য প্রথমেই নিয়ম করে দেওয়া হল যে শহর কি গ্রামের সব চেয়ে বড় আর ভাল বাড়ীগুলোতে বসবে স্কুল। আগে যে সব বাড়ীতে থাকতেন রাজা জমিদার, এর পর থেকে সেগুলোতে স্কুল বসতে লাগল। পড়ুয়াদের তখন স্ফূর্তি দেখে কে? আইন করা হয়েছিল কিনা সবাইকে পড়তে হবে তাই পিলপিল করে ছাত্ররা সব নতুন স্কুল বাড়ীতে ছুটে এল।

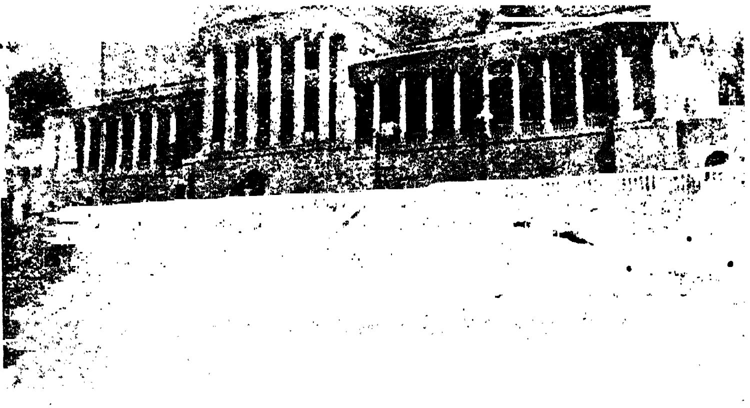
বুড়োদেরও উৎসাহ কম নয়। তারাও চাইল লেখাপড়া শিখতে। তাদের জন্যও আলাদা বন্দোবস্ত করা হল। তিরিশ, চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের বুড়োদের লিখতে শিখে কি আনন্দ! দুহাত তুলে তারা লেনিনকে আশীর্ব্বাদ করল।

সোভিয়েটে বাসকরে কত জাতি। তাদের অনেকের আবার লেখার ভাষাই ছিল না। যাযাবর বেদুইনদের কোন

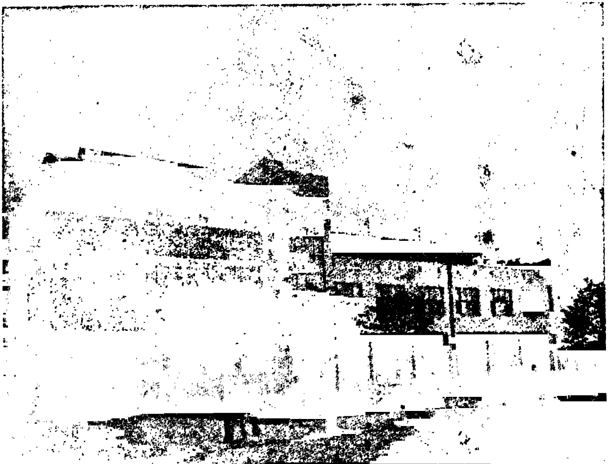
কালেই লেখা পড়ার গরজ ছিল না। তারা শুধু মুখে মুখে কথা বলেই কাজ চালাত। তাদের জন্যও সোভিয়েট থেকে অনেক কষ্ট করে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা হল। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের সময় জারের রাশিয়ায় মাত্র ৮১ লক্ষ ছাত্র পড়ত নীচু ক্লাশে, আর ১৯৩৮-৩৯ সালে পড়ত প্রায় পাঁচকোটি ছাত্র। ২৪ বছরের মধ্যে ছয়গুণ ছাত্র বেড়ে গিয়েছিল স্কুলে। ১৯১৪ সালে দশলক্ষ ছাত্র পড়ত উঁচু ক্লাশে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ছাত্রের সংখ্যা হয় সোয়া কোটি! আবার ১৯১৪ সালে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত ১ লাখ ১২ হাজার ছাত্র ছাত্রী। ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৬ লক্ষ।

জারের আমলে দুশো বছরে যত স্কুল হয়েছিল সোভিয়েট সরকার মাত্র কুড়ি বছরেই তার চেয়ে বেশী স্কুল প্রতিষ্ঠা করল। এক দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতেই কুড়ি হাজার স্কুল তৈরী করা হয়।

এতদিন সোভিয়েটে স্কুল কলেজে পড়তে কোন মাহিনা লাগত না। কেউ যে পয়সার অভাবে পড়তে পাবে না তা হবার যো ছিল না সোভিয়েটে। কিন্তু এখন সোভিয়েটে মজুর চাষী সকলেরই অবস্থা অনেক ভাল। সব লোকই মাহিনা দিতে পারে বলে উঁচু স্কুলে ১৯৪১ সাল থেকে মাহিনা দিতে হয়। তবে সরকারী বৃত্তি আছে এখনো হাজার হাজার। তাছাড়া ছাত্রদের থাকার বোর্ডিংও আছে অনেক।



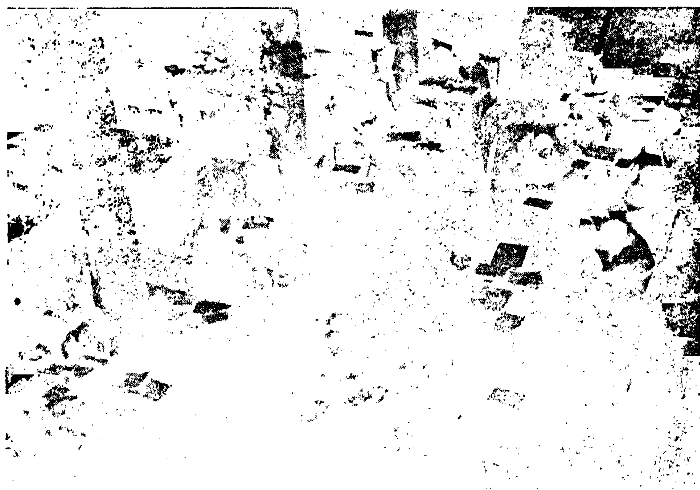
শোচী সহরের স্বাস্থ্য নিবাস—মজুররা এখানে হাওয়া বদলাতে আসে।



এমনি নতুন ধরনের স্বাস্থ্য নিবাস তৈরী হয়েছে অনেক



কারখানার বিশ্রামাগার



কারখানাতেও লাইব্রেরী আছে— কেমন সুন্দর পড়বার ঘর দেখেছো ?

উজবেকিস্থান ছিল জারের আমলে অজ্ঞানের অন্ধকারে। আর আজ সেখানে ছাত্রদের মাথাপিছু সরকার থেকে ৩০।৪০ রুবল খরচ করা হয়। স্কুল কলেজ যেমন বাড়ছে নিত্য, তেমন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ও হচ্ছে সোভিয়েটের বিভিন্ন প্রদেশে। বিয়েলোরুশিয়াতে এখন আছে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়, আজার-বৈজানে ১৭, কাজাকস্থানে ১৯, উজবেকিস্থানে ২০, তুর্ক্মেনি-স্থানে ৫, আর্মেনিয়াতে ৮, ইউক্রেনে ১৩৯ টি।

আমাদের এতবড় ভারতবর্ষে কটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে জানো—মাত্র কুড়ি পঁচিশটি।

শুধু যে কেবল একদিক থেকে স্কুল কলেজই সোভিয়েটে করা হয়েছে তা নয়। ছাত্রদের শেখাবারও এত সব নতুন আর মজার মজার বন্দোবস্ত হয়েছে যে তা বলবার নয়।

আগের যুগের মত আর এখন কাউকে ৪।৫ মাইল রাস্তা হেঁটে রোজ স্কুলে আসতে হয় না। প্রত্যেকেরই বাড়ীর আসে-পাশেই স্কুল রয়েছে। ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্য্যন্ত একই সঙ্গে পড়াশুনা করে। সে দেশের বাপমা ছেলে আর মেয়ের মধ্যে ব্যবহারের কোন তারতম্য করেন না।

স্কুলে ঢোকবারও আগে থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। একেবারে বাচ্চাদের জন্য ক্রেচে, আর তার চেয়ে একটু বড়দের নিয়ে কিণ্ডারগার্টেনেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। এক রুশ প্রদেশেই ১৯৪৩ সালের পয়লা জানুয়ারীতে ছিল ১২,৩৭৯ কিণ্ডারগার্টেন। ক্রেচেতে সব বাচ্চারা থাকে তিনবছর পর্য্যন্ত

তারপর, ছোটদের তিন থেকে সাতবছর কাটে কিণ্ডারগার্টেনে। সাত থেকে শুরু হয় স্কুলের পড়া।

প্রায় প্রত্যেক ফ্যাক্টরী আর খামারেই ক্রেচে থাকে। মা'রা কারখানায় কাজ করতে যাবার সময় বাচ্চাদের সেখানে রেখে কাজে যান। কাজ থেকে মাঝে মাঝেই তাঁদের ছুটি দেওয়া হয় বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার জন্য। প্রত্যেক ক্রেচেতে ভাল লোক থাকেন বাচ্চাদের তদারকের জন্য। ক্রেচেতে হল বাচ্চাদের বাড়ীঘর সবই একসঙ্গে কিনা।

কিণ্ডারগার্টেনে সোভিয়েটের মাস্টারমশায়রা মন্তেসরীর কথামত চলেন না। তাঁরা অন্যভাবে শিক্ষা দেন। ছোটরা যাতে বড় হয়ে সবাই মিলেমিশে কাজ করতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের দেশকে ভালবাসতে পারে এ সব বিষয়ে খুব নজর রাখা হয়! কিণ্ডারগার্টেনে কোনও রকম বই পড়ানো হয় না। খালি কাজ আর খেলার মধ্য দিয়েই তাদের সব কিছু শেখানো হয়। যাঁরা এসব কিণ্ডারগার্টেনে শেখান তাঁদের নিজেদের আলাদা সমিতিও আছে। সেখানে নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা হয় আরও ভাল করে শেখবার জন্য।

সোভিয়েটের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা-ভব্যতা, নিয়মানুবর্ত্তীতা, স্বদেশ-তত্ত্ব, দেশপ্রেম সব কিছু শেখানো। উঁচু শ্রেণী থেকে বেরিয়েই যাতে ছাত্ররা ইচ্ছে করলে সুবিধামত রোজগার পত্তর করতে পারে—তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়।

আর আমাদের দেশে কি হয়? বি,এ; এম,এ পাশ করলেও কেউ ভাল কাজ পায় না। ম্যাট্রিক পাশের তো কথাই নেই। প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখবে. কত লোক বেকার বসে থাকে।

সোভিয়েটে পড়া আর কাজ করা দুটো একসঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয় বলেই ছাত্রদের এত সুবিধা।

গ্রামের উঁচু ক্লাশে যখনই বিজ্ঞান পড়ানো হয় তারপরেই ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় সত্যিকারের কলের লাঙ্গল চালানো শেখাতে। তখন ছাত্ররা সহজেই বুঝতে পারে কি করে যন্ত্রপাতি দিয়ে ভালভাবে চাষ করা যেতে পারে।

চারবছর নীচু ক্লাসে পড়বার পর ছাত্ররা ইচ্ছে করলে সাত বছরের উঁচু ক্লাসে ঢুকতে পারে। তা না হলে তারা ভাল কোন রোজগারী কাজ শেখার স্কুলেও ভর্ত্তি হতে পারে। সাত বছরের ক্লাশও কিন্তু পুরো নয়। খুশি হলে ছাত্ররা পুরো দশবছরই উঁচু ক্লাসের স্কুলে পড়তে পারে। তা না হলে তারা কোন বৃত্তি শেখার স্কুলেও তিন কি চার বছর হাতে কলমে কাজ শিখতে পারে।

উঁচু ক্লাসের পরেই হল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা যায়। সতেরো বছর পর্য্যন্ত ছাত্রদের স্কুলে থাকতে হয়। ১৯৪৫ সালে আইন করে স্কুলের বয়েস এক বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েটে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, এই সব বিষয় পড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয় বেশী।

নীচু ক্লাসের স্কুলে ছাত্ররা নিজেদের মাতৃভাষা আর রাশিয়ান এই দুটো ভাষা শেখে। তার সঙ্গে থাকে পাটিগণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শরীর চর্চ্চা, আঁকা আর গান। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাটিগণিত আর মাতৃভাষা শেখানো হয় সব চেয়ে বেশী।

দশ বছরের উঁচু স্কুলের পাঠ্য তালিকায় আছে—

১।	মাতৃভাষা ও সাহিত্য—	২৬১৬	ঘণ্টা
২।	অঙ্ক —	২০৯২	"
৩।	পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব —	৮৭৬	"
৪।	সমাজ আর ইতিহাস বিজ্ঞান—	৯৩০	"
৫।	নতুন ভাষা —	৬৬৩	"
৬।	ভূগোল —	৫৮৬	"
৭।	আঁকা —	৪৯১	"

সোভিয়েটে স্কুলের পড়া স্কুলেই তৈরী করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের বালাই তত নেই, বাড়ীর কাজও বড় একটা দেওয়া হয় না। চার্ট করে, ম্যাপ এঁকে নানা ভাবে ছাত্রদের পড়া শেখানো হয়। দরকার হলে তাদের নিয়ে। মিউজিয়ম কি অন্য কোথাও চলে যান মাস্টাররা। তাতে চোখের সামনে নানা উদাহরণ দেখলে ছেলেরা সহজেই পড়া বুঝতে পারে।

১৯৪২ সালে মস্কৌর এক স্কুলের ছাত্ররা ইতিহাসে নেপোলিয়নের কাহিনী পড়ছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সেনাদের বোরোদিনো বলে এক জায়গায় ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে নেপোলিয়ন হেরে যান। এবার আবার হিটলারের নাৎসী সৈন্যদের সঙ্গে সোভিয়েটের যুদ্ধ হচ্ছিল সেখানে। ছাত্ররা নেপোলিয়নের ইতিহাস ভালকরে বোঝবার জন্য সোজা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ভাল করে সমস্ত বিষয় বুঝে নিয়েছিল। গোলাগুলি কামান বন্দুকের ভয় তারা করে নি।

ক্লাশ ফাইভের ওপর প্রত্যেক ক্লাশেরই ছাত্রদের নিজস্ব এক একটি ছাত্রসমিতি আছে। মাস্টারমশায়দের কাজে সাহায্য করা হল এদের কাজ। নীচু ক্লাশে মনিটার থাকে। তারা পরিষ্কার পরিছন্নতা শেখায়।

সোভিয়েটের স্কুলের ছাত্ররা নিজেরা ফার্স্ট সেকেণ্ড হবার চেষ্টা না করে কি করে ক্লাশের সবাই একসঙ্গে ভাল হবে তারই দিকে নজর দেয় বেশী। সে-দেশে প্রতিযোগিতা হয় ভিন্ন ভিন্ন ক্লাশের সঙ্গে। ক্লাশের যারা খারাপ ছেলে, কি যারা কোন কারণে হয়ত পড়া তৈরী করতে পারে নি ভাল ছেলেরা নিজে থেকে তাদের শেখায়। এমনি করে ক্লাশ শুদ্ধ সব কটি ছেলের পরীক্ষার ফলের তুলনা হয় স্কুলে। তখন স্কুলের মধ্যে যে ক্লাশের ছেলেরা সব চেয়ে ভাল করে তাদের দেওয়া হয় পুরস্কার।

সোভিয়েটের মাস্টাররা বলেন যে পাজী ছাত্র কখনই হতে

পারে না। ভাল লাগে না বলেই ছেলেরা সয়তানী করে। ভাল করে পড়াতে পারলে সবাই মন দিয়ে পড়বে নিশ্চয়।

প্রত্যেক ক্লাশের ছাত্ররা নিজেদের লেখা নিয়ে কাগজ বের করে। তাকে বলে প্রাচীর পত্র। যে ছেলে খারাপ তার দোষত্রুটি সম্বন্ধে সে কাগজে লেখা হয়। তাতেই অনেকে শুধরে যায়। আর যদি তা না হয় তাহলে তাকে আরও ভাল করে বোঝানো হয়। দরকার হলে তার বাবা মাকে খবর দেওয়া হয়। যদি বাবা মার কোন দোষ থাকে বলে মনে হয় তখন তাঁদের কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন মাস্টাররা। সোভিয়েটের প্রায় স্কুলের সঙ্গে ছাত্রদের বাবা-মাদেরও এক সমিতি থাকে। মাস্টাররা হরদম গার্জ্জেনদের সঙ্গে ছাত্রদের কাজ কর্ম্ম নিয়ে গল্প, আলাপ আলোচনা করেন। কোন বাবা-মা যদি ছেলের পেছনে খাটতে নারাজ হন তা হলে বাপ মা যেখানে কাজ করেন সেখানের কারখানা সমিতিকে সব কথা জানিয়ে দেন মাস্টরেরা। তখন আর উচ্চবাচ্য করার ক্ষমতা থাকে না তাঁদের।

এতকরেও যদি খারাপ ছেলে না বদলায় তো তাকে পাঠানো হয় দুষ্টু ছেলেদের স্কুলে।

স্কুলের ছাত্র আর মাস্টাররা দেশের সেবা করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সে বিষয়ে সোভিয়েটে তরুণ "পাইওনীয়ার সঙ্ঘ" হচ্ছে প্রধান। যে সব ছেলে কথা শোনে, পড়াশুনা ভালকরে করে, কাজে গাফিলতী করে না, সত্যবাদী, তাদের

দশ বছর বয়স হলেই তারা পাইওনীয়ার সঙ্ঘে যোগ দিতে পারে।

যে সব ছাত্রদের বাড়ীতে অনেক লোক, ছোট বড় ভাই বোন বেশী তারা বাড়ীর হয়ত কাজকর্ম্ম করে ভাল পড়া তৈরী করতে পারে না। পাইওনীয়ারের দল গিয়ে তাদের বাড়ীর কাজকর্ম্ম করে দিয়ে আসে।

এ যুদ্ধের সময় মেয়ে পাইওনীয়াররা অনেক যায়গায় দর্জ্জীর দোকান করে লালফৌজের জামা কাপড় তৈরী করেছে। কাঁচের বোতলে করে শত্রুর দিকে ছুঁড়ে মারবার মত এক রকম আগুনের হল্কা তৈরী করত লালফৌজ। এসব পাইওনীয়ারা রাস্তা ঘাট থেকে যত রকমের বোতল যোগাড় করত সে জন্য। ঐ বোতল কি লোহা লক্কড় বিক্রী করে তারা যে টাকা পেত তা দিয়ে লালফৌজের ছেলেমেয়েদের বেড়াতে পাঠাত দেশের ভাল ভাল যায়গায়।

১৪ বছর বয়স হলে পাইওনীয়াররা তরুণ কমিউনিস্ট লীগে যোগ দেয়। সোভিয়েটে এদের বলে "কমসোমল"।

প্রতেক স্কুলে এই সব পাইওনীয়ার আর কমসোমল মিলে হরেক রকমের চক্র বা আড্ডা তৈরী করে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, খেলাধূলা সমস্ত বিষয়েরই 'চক্র' থাকে। ছুটির অবসরে কিংবা টিফিন হলে ছেলেরা বাজে সময় নষ্ট না করে ঐ সব 'চক্রে' যোগ দেয়। সেখানে গল্পসল্পের মধ্য দিয়েও নিজেরা অনেক কিছু শিখতে পারে।

স্কুলের 'চক্র' ছাড়াও প্রতেক শহরে নানা সমিতি আছে! সেখানে গিয়ে ছাত্ররা মাস্টারদের সঙ্গে থেকে অনেক কিছু জেনে আসে। যত বড় বড় বিজ্ঞানী—ডারউইন, মিচুরিন, লাইসেঙ্কো, এঁদের গবেষণার বিষয় ঐ সব সমিতিতে শেখানো হয়। গ্রামের স্কুলের ছাত্ররা ক্লাসের শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে শেখা জ্ঞান কাজে লাগায় যত সব মুরগী আর গরুর তদারক করে। বইয়ের বিদ্যার সঙ্গেই তারা সব কিছু শেখে হাতে কলমে।

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যারা গবেষণা করতে চায় তাদের কাজের সাহায্য করার জন্যেই এত আয়োজন। ছেলেবেলা থেকে গবেষণায় উৎসাহ পেলে অনেকেই পরে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে। নিজেদের খেয়াল মত একটা না একটা চক্র ছাত্ররা পাবেই। মাঝে মাঝে দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিতরা এসব 'চক্রে' এসে ছোটদের লেখা প্রবন্ধ মন দিয়ে শোনেন। ভুল থাকলে শুধরে দেন—আরও ভাল কি করে লেখা যায় তা শিখিয়ে দেন। ছোট বলে তাদের হেয় মনে করে না কেউ সোভিয়েট দেশে।

লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ললিত কলা চর্চ্চাও বাদ যায় না সেদেশে। প্রত্যেক স্কুলেই নাচ, গান, থিয়েটারেরও চক্র থাকে।

এছাড়া সব স্কুলেই ভাল ভাল লাইব্রেরী রয়েছে পড়বার জন্যে।

বড় বড় স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মাস্টররা পরীক্ষার পর গ্রামের খেত খামারের কাজে লেগে পড়েন। এমনি একবার



সোভিয়েটের মেয়েরা আজ মুক্ত—
এঁরা হচ্ছেন তুর্কীস্থানের কাপড়ের কলের মেয়ে মজুর।



সারা দিনের কাজের পর বাড়ী ফিরে মেয়ে মাকে গান শোনাচ্ছেন

এ্যান্টন ম্যাকারেঙ্কো (চশমা চোখে প্রথম সারিতে বসা)—যত দুষ্টু আর ভবঘুরে ছেলেদের ধরে এনে ইনি মানুষ করার ভার নিয়েছিলেন।

সুখারেভএর স্কুলের ছেলেরা সাতটা ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েতী খামারে কাজ করবে ঠিক হয়। ছেলেদের সব ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দলের নেতা থাকেন তাদের ক্লাশের মাস্টার মশায়। এইসব ছেলেদের দল দেখে তো খামারের পাকা গৃহস্থরা হেসেই অস্থির। এরাই নাকি ফসল ফলাবে মাটিতে তবেই হয়েছে। তাদের তাচ্ছিল্য দেখে ছোটদের উৎসাহ বাড়ল বই কমল না এতটুকু। ছেলেরা কোমর বেঁধে নামল কাজে। সবাই মনে মনে ভাবছে দেখিয়ে দেবো কেমন করে কাজ করতে হয়।

সত্যি তাদের জমি নিড়োনো এত ভাল হল যে পাকা গৃহস্থরা অবাক হয়ে গেল সব।

ভোর সাতটার কাজ আরম্ভ হত। সাধারণ-খাবার-ঘরে (হোটেলের মত) তারা এসে চা জলখাবার খেয়ে নিত। দিনকার কাজের ফর্দ্দ তারা আগের দিন সন্ধ্যায় দলের নেতার কাছে থেকে নিত জেনে। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত চলত কাজ। তারপর স্নানের পালা। স্নানের পর খাওয়া আর বিশ্রাম—পরে আবার কাজ!

এ কাজে ছাত্রদের ছিল ভীষণ উৎসাহ। সারা গ্রীষ্মের মধ্যে কেউ একদিনও কামাই করে নি। কাজের জন্য তারা মাহিনাও পায় রীতিমত। বিনিপয়সায় খাটতে হয় না তাদের!

সোভিয়েটের ছোটদের সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে

যে, তারা সত্যিকারের স্বাধীনতা কাকে বলে তা জানে। মাস্টার, কিং মালিক, কারুর ওপর কোনও ভরসা রাখে না তারা। বাবা মার কাছে থেকে শোনে যে সোভিয়েটে এমন কোন কাজ নেই যা তারা করতে পারবে না!

বিপ্লবের আগে রাশিয়াময় একদল ভিখিরীছেলে ঘুরে বেড়াত। ভিক্ষে করতে করতে তারা এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে চলে যেত। দুর্ভিক্ষ মহামারীতে হয়তো কারও বাবা, মা মরে যাওয়ায় ভিক্ষে করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। এদের সবাইকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করা হয়েছে এখন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছোটদের জন্য ৮৬৪টি বিরাট বাড়ী আর ক্লাব, ১৭০টি ছোটদের পার্ক, ১৭৪টী সিনেমা ও থিয়েটার তৈরী করা হয়েছে।

প্রত্যেক ছুটিতে ছুটিতে ছেলেরা স্কুল ছেড়ে চলে যায় দূরে কোথাও না কোথাও! ক্রাইমিয়া, ককেশাসেই এ ধরনের ক্যাম্প হয় বেশী। মাস্টাররাও তখন ছোটদের সঙ্গে আসেন। তাঁরা হাজার হাজার মাইল তাদের নিয়ে রেলে আর নয়তো, সমুদ্রের বুকে স্টীমার করে বেড়ান। দেশ ভ্রমণের মত শিক্ষা আর কিছুতেই হয় না! সোভিয়েট সরকার সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে। এসব ভ্রমণের খরচ বেশীরভাগই ছাত্রদের দিতে হয় না।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এ রকম যত কিছু জ্ঞানের বিষয় হতে পারে তাদের সবাইকে বলে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষের উপকার। বিজ্ঞান সাহায্য না করলে মানুষ আজ এত অসাধ্য সাধন করতে পারত না।

তবে বড়লোকদের হাতে যে দেশে শাসন ক্ষমতা থাকে সে দেশে তাঁরা বিজ্ঞানের ব্যবহার বেশী করেন্ না। শুধু যে সব বিজ্ঞানচর্চ্চা করে দু'পয়সা লাভ হবে তাঁরা সেই সবই আলোচনা করেন। যাতে লাভ নেই বা প্রচুর পয়সা খরচ করতে হবে মানুষের হাজার ভাল হলেও তাঁরা সে পথ মাড়াবেন না।

আমাদের দেশের শাসন কর্ত্তারা বিজ্ঞান শিক্ষাকে তেমন দরকারী বলে মনে করেন না। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়েই তাঁরা সভ্যতার কথা ভাবেন।

জারের যুগে রাশিয়াও ছিল তেমনি। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মহিমময় পিটার প্রথম সে দেশে বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন

করেছিলেন। কিন্তু তাতে দুচার জন ছাড়া কারুর সুবিধা হত না বেশী। লোমোনোসভ, পাভলভ, মেণ্ডেলিভ, কার্পিনস্কী, মেচনিকভ্, এঁরা হচ্ছেন সব জারের যুগের নামকরা বিজ্ঞানী।

সোভিয়েটের শাসনকর্ত্তারা ঠিক এর উল্টো পথে চললেন। তাঁদের মতে সমাজের উন্নতি নির্ভর করছে বিজ্ঞান চর্চ্চার উপর। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা কিংবা চাষবাস সব কিছুর পরিকল্পনা করবার সময় এঁরা বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। সেজন্য প্রত্যেক কলকারখানা আর গ্রামের খামারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে অসংখ্য গবেষণাগার। ১৯৩৮ সালে ছিল এমনি ২২৯২টি গবেষণার মন্দির। সারা দেশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিজ্ঞানী গবেষণা করতেন। তার মধ্যে একমাত্র নিখিল সোভিয়েটের বিজ্ঞান পরিষদে কাজ করে চার হাজার বিজ্ঞানী।

এবছর এই বিজ্ঞান পরিষদের দুই শত বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। পরিষদের গত বৎসরের সভাপতি ছিলেন ভ্লাদিমির কোমারভ। তিনি আমাদের দেশের গৌরব সি, ভি, রমন, মেঘনাদ সাহা এবং আরও অনেককে সে উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করেছেন।

সোভিয়েটে বিজ্ঞানের নতুন কোন আবিষ্কার হলে সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাকে। সেজন্য দেশের লোকও উঠে পড়ে লেগেছে বিজ্ঞান চর্চ্চা করতে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে (১৯৩৮-৪২) ছিল যে

সোভিয়েটের সমস্ত লোককে কম পক্ষে অন্ততঃ ইঞ্জিনীয়ারের মত শিক্ষিত করতে হবে।

কিছুদিন আগে তরুণ কমিউনিস্ট সঙ্ঘ ও বিজ্ঞান পরিষদের উৎসাহে এক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাতে আট হাজার তরুণ ভূতত্ত্ব, রসায়ণশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে রচনা পাঠিয়েছিল।

সোভিয়েট কোনো নতুন ধরনের বিজ্ঞান আবিষ্কার করে নি। সেই পুরাতন দুরবীন আর অনুবীক্ষণ, নিয়েই তারাও গবেষণা করে। বিজ্ঞানের সঙ্গে সে দেশের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে। এত বিরাট পরিকল্পনা সফল করা তো মুখের কথা নয়। প্রথমে তাই বিদেশ থেকেও অনেক বিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হয়েছিল তাদের।

১৮৮১ সালে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক র‍্যামজে আবিষ্কার করেছিলেন যে খনি থেকে কয়লা না তুলে মাটীর নীচে থেকেই গ্যাস করা যায়। কিন্তু ইংরেজ সরকার সে আবিষ্কার নিয়ে মাথা ঘামাননি কোন দিন।

লেনিন সে আবিষ্কারের খোঁজ রাখতেন। তিনি দেখলেন যে খনি থেকেই গ্যাস করতে পারলে হাজার হাজার লোকের খাটুনি কমতে পারে। তাছাড়া খনির নীচে কাজ করার অস্বাস্থ্যকর অবস্থাও কমবে অনেকটা। এখন যেমন খনির মজুররা ভুতের মত জীবন যাপন করে—তখন আর তাদের সে কষ্ট থাকবে না।

বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট দেশে কয়লা খনি থেকেই এভাবে গ্যাস তৈরীর কাজ হচ্ছে। এতে খনি থেকে কয়লা তোলার কাজ যেমন কমেছে তেমনি কয়লা টেনে নেবার জন্য যানবাহনেরও দরকার হচ্ছে না। সেই সব রেল গাড়ীতে মানুষের আরও কত ভাল কাজ হতে পারে।

বিজলীর কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

আর একটা খবর শোন। সব দেশের পণ্ডিতরাই বলেন যে কয়লা যতই থাক না কেন একদিন তা ফুরোতে বাধ্য। আজ যদি না হয় তো একশ, হাজার বছর পরে ফুরোবেই। তখন কি করে কাজ চলবে? তার উত্তরে সোভিয়েটের বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তাঁরা সূর্য্যের উত্তাপ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে কাজ চালাবেন। এখনই অনেক জায়গায় সূর্য্যের আলোর ব্যবহার হচ্ছে! কিন্তু সূর্য্যেরও শক্তি ফুরিয়ে যেতে পারে তো। তখন? তারও ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে আছে অসম্ভব শক্তি জমানো! বিদ্যুতের জোরে সেগুলো ভাঙতে পারলে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসবে! সোভিয়েটে তা দিয়েও কত কাজ হচ্ছে! যন্ত্রের মানুষও তৈরী করেছে তারা।

এবারকার যুদ্ধে কত লোক যে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সোভিয়েটের অনেক কারখানায় এইসব কলের মানুষ কাজ করত বলে যুদ্ধে লোকের অভাব হয় নি। কলের মানুষের

মাথায় ভর্ত্তি রয়েছে চলন্ত অণু-পরমাণু। কারখানার কাজের একটা ছক করে তাতে নানা রঙের আলো জালিয়ে রাখা হয়। সেই এক একরকম আলোর ধাক্কায় কলের মানুষের হাত পা এক একরকমে নড়া চড়া করে। তারা তখন পাকা ওস্তাদের মত ট্যাঙ্ক, কলের কামান সব তৈরী করে।

চাষবাসে বিজ্ঞান যে কত সাহায্য করতে পারে তা সোভিয়েটে না গেলে কেউ জানতে পারবে না। সোভিয়েটের গোড়া পত্তন থেকেই বিজ্ঞানীরা দেশ বিদেশে যেখানে যত রকমের গাছপালা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করেছিলেন। পারস্য, আফগানিস্থান, ভারত, মঙ্গোলিয়া, সিংহল, জাভা, চীন আমেরিকা—আরও সব এক গাদা দেশে তাঁরা এসেছিলেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের কর্ত্তা হচ্ছেন এম, আই, ভাভিলভ। পৃথিবীর সবদেশের গাছপালার নমুনা আছে সোভিয়েটে তাঁর কাছে। আমাদের দেশেরই একজন পণ্ডিত ডি, ডি, কোশাম্বী পুনার অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন যে এদেশে একরকম গাছ দেখে অনেককে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভারতের কেউ তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। সে সময় সোভিয়েটের একটা উদ্ভিদতত্ত্বের বই থেকে এক জন ভারতীয় পণ্ডিত জিনিসটি তাঁকে বুঝিয়ে দেন।

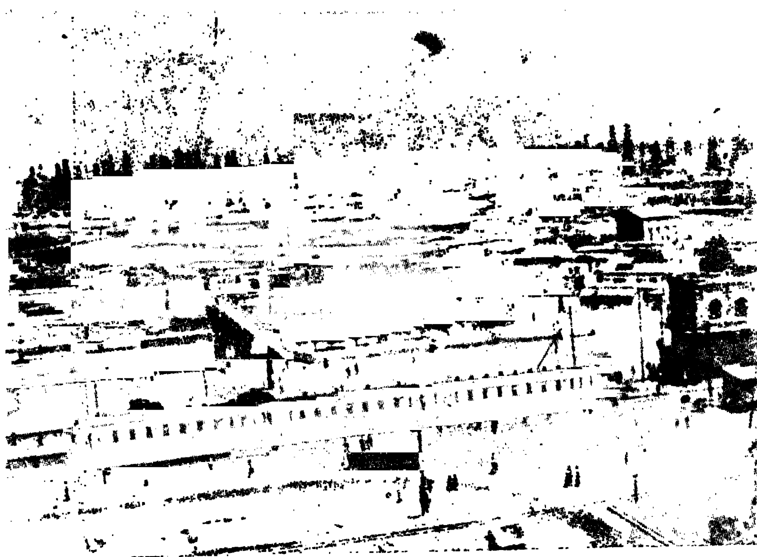
লেনিনগ্রাদের গবেষণাগারে জমানো আছে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা ধরনের ৩০ হাজার গমের গাছ। ওদেশের লোকের গমই প্রধান খাদ্য কিনা তাই এত তদ্বির। গম হয়

সাধারণতঃ, বছরে একবার। কিন্তু সোভিয়েটের বিজ্ঞানীরা হরেক রকম কলম করে এ-গাছের সঙ্গে সে-গাছ জোড়া দিয়ে এক অদ্ভূত গম গাছ তৈরী করেছেন। সে গম গাছ ঘাসের মত সারা বছর ধরেই হবে! একবার লাগালেই হল বছর বছর লাগাবার হাঙ্গামা করতে হবে না। যিনি এ অসাধ্য সাধন করেছেন তাঁর নাম হচ্ছে নিকোলাই সিৎসিন। তিনিই এখন কৃষি বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি।

তাছাড়া সেভিয়েট বিজ্ঞানীরা নানা চেষ্টা চরিত্র করে আবিষ্কার করেছেন এক দেশের জিনিস অন্য দেশে তৈরী করবার। জমাট বরফের মধ্যে কিছু হতে পারে না বলে আগে লোক হতাশ হত। আর এখন সেই সব উত্তর মেরুতেও হচ্ছে গম। এসব কাজ শিখিয়েছেন আইভান মিচুরিন। তিনি ঠিক ম্যাজিসিয়ানদের মত ছু ইঞ্চি গাছে জাম ফলাতে পারতেন; যেখানে কস্মিন কালে শীতের চোটে লোক থাকতে পারত না সেখানে ফলাতেন টুকটুকে পিচ ফল! বরফের মধ্যে ছোট ছোট চেরী গাছ করলেন তিনি। হাত দিয়েই সে সব গাছের চেরী ফল পাড়া যায়। সেই সুমেরু রাজ্যেও দেখতে পাবে সাদা বরফের মধ্যে ফুটে আছে মিচুরিনের থলো থলো গোলাপ। আর এক জন হচ্ছেন লাইসেঙ্কো! তিনি বার করলেন কি করে একই জমিতে আগের চেয়ে চার পাঁচগুণ বেশী ফসল ফলানো যায়। ছেলে বেলায় তিনি পড়েছিলেন যে গাছপালা সূর্য্যের



নীপারের বিশ্ববিখ্যাত বাঁধ—এবারের যুদ্ধে সোভিয়েটের সৈন্যরা নিজেরাই এটা ভেঙে ফেলেছিল, আবার তারা গড়বে এর চেয়েও ভাল, এর চেয়েও বড় বাঁধ।



বাকুর তেলের খনির হাজার চোঙা…







কারাকুম মরুতেও এখন
ফসল ফলছে

আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। বড় হয়ে চাষ করবার সময় সেই কথাই তাঁর মাথায় ঘুরত। তাই যদি হয় তবে এক এক বিঘেয় যত বেশী গাছ লাগানো যাবে ততই বেশী ফসল হবে এত সোজা কথা। কিন্তু ভাবতে যত সহজ কাজে জিনিসটি তত সহজ নয়। বহু দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তবেই তিনি সফল হয়েছিলেন। এত সব জিনিস আবিষ্কার হয়েছিল বলেই জার্ম্মানী সমস্ত ইউক্রেন দখল করলেও সোভিয়েটের লোক কেউ না খেতে পেয়ে মরে নি।

ডাক্তারীতে সোভিয়েট যে কত এগিয়ে গেছে তার তুলনাই হয় না কোন দেশের সঙ্গে।

দূরে কোন পাহাড়ের ওপর গাছের ডাল চাপা পড়ে রক্তা-রক্তি কাণ্ড হয়ে কেউ হয়তো মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। সঙ্গীরা কোনও রকমে তাকে ধরাধরি করে কাছের গ্রামে নিয়ে এসে বেতারে খবর পাঠাল চারিদিকে। দেখতে দেখতে তাদের মাথার ওপরে এরোপ্লেন ঘুরতে লাগল মৌমাছির মত। তাথেকে টুপ করে প্যারাসুটের সঙ্গে পড়ল একটি প্যাকেট! এতে রয়েছে বোতলে ভরা রক্ত। সেই রক্তের দৌলতে প্রাণ বাঁচল লোকটীর।

১৯২৬ সালে মস্কৌতে এমনি রক্ত যোগাড় করা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর এখন সমস্ত রাশিয়াতেই এটা ছড়িয়ে পড়েছে। সুস্থ মানুষ গিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে সময়ে সময়ে রক্ত দিয়ে আসে। প্রত্যেক বোতলের গায় লেখা থাকে দাতার নাম

ধাম। যে বাঁচল সে হয়তো একদিন এসে দাতাকে ধন্যবাদ জানাল ঃ

"নমস্কার মশায়!"

"কে আপনি? চিনতে পারছি না তো?"

"সে কি কথা হল? নিজের রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচালেন আর এখন কিনা"...

একটা হাসির রোল পড়ে যাবে! দাতার জীবন হবে সার্থক!

শুধু রক্ত নয় সোভিয়েটে চোখের আর স্নায়ুরও ব্যাঙ্ক আছে! চমকে উঠ্‌লে তো? তবে শোন।

ফিলাটভ নামে একজন মস্তবড় চোখের ডাক্তার আছেন সে-দেশে। কারুর চোখ খারাপ হলে তিনি তাদের পাথরের চোখ না দিয়ে অন্য কারুর চোখ বসিয়ে দেন! কতলোকের যে এমনি চোখ লাগানো হয়েছে তার নিখুঁত হিসেবও আছে তাঁদের!

মানুষের শরীরের সবচেয়ে দরকারী জিনিস হচ্ছে স্নায়ু। স্নায়ুর সাহায্যেই সব কাজ হয়। সেই স্নায়ু কোনও কারণে জখম হলে লোক পঙ্গু হয়, আরও কত কষ্ট পায়। একজন মেয়ে ডাক্তার লেনা স্টার্ন এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যে তাতে অন্যের স্নায়ু কেটে এনে ডুবিয়ে রাখা যায় স্বচ্ছন্দে। পরে সেই স্নায়ু দরকার মত আর একজনের গায়ে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

তোমার হয়তো হাত কেটে গেছে রক্ত পড়া কিছুতেই থামছে না! ব্লাড ব্যাঙ্ক আর কত রক্ত দেবে! একজন ডাক্তার আবিষ্কার করেছেন এক মজার জিনিস। সেটা লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই তোমার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে!

পৃথিবীর আর কোথাও কিন্তু এগুলো আবিষ্কার হয় নি এখনো! কি করে একজনের স্নায়ু অন্যের গায়ে বসাতে হয় তা ওগনেভ নামে একজন সোভিয়েট ডাক্তার কলকাতায় এসে মেডিকেল কলেজে দেখিয়ে গেছেন এই সেদিন!

এ তো হল সব সহজ কথা! মরা মানুষ বাঁচাতে শুনেছো? সোভিয়েটের ডাক্তাররা তাও করেছেন। যুদ্ধের মধ্যে অনেক সৈন্য হঠাৎ গুলী লেগে মরে গিয়েছিল তার মধ্যে বাহান্ন জনকে ডাক্তাররা বাঁচিয়ে তুলেছেন!

যাঁদের কাছে তোমরা এ গল্প করবে তাঁরা হয়তো হেসেই উঠবেন। কিন্তু সত্যি এতে হাসবার কিছু নেই। দেশ বিদেশের ডাক্তারদের সামনে সোভিয়েটের ডাক্তাররা এ সব পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন। এদেশের অমৃতবাজার পত্রিকা তো অনেক ছবি ছাপিয়ে দেখিয়েছিল কি করে সোভিয়েট ডাক্তাররা মরা মানুষ বাঁচান!

সোভিয়েটে কারুর অসুখ করলে ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে ডাকতে হয় না। সেখানে বিনি পয়সায় সমস্ত চিকিৎসা

হয়। গ্রামে গ্রামে হাসপাতাল হয়েছে, হাওয়া বদলাবার জায়গাও হয়েছে অনেক !

জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো চোখে লাগলেই মানুষ পাগল হয়ে যায় আবিষ্কারের নেশায়। মধ্যযুগের পরে যখন নব জাগৃতি এসেছিল ইউরোপে তখনো লোকে পাগল হয়ে দিকে দিকে বেরিয়েছিল দেশ আবিষ্কার করতে ! বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান সোভিয়েটের লোকও বেরুল প্রকৃতি জয় করতে। প্রথমেই নাও সুমেরু আবিষ্কারের কাহিনী।

সোভিয়েটের প্রায় সমস্ত উত্তর সীমানা জুড়ে রয়েছে সুমেরু প্রদেশ। সে অঞ্চলের সঠিক আবহাওয়ার খবর জানা দরকার সোভিয়েটের বিজ্ঞানীদের। কখন কেমন করে বরফের স্রোত আসে তা না জানলে উত্তর অঞ্চলে চলা ফেরা করা মুস্কিল। সেজন্য অধ্যাপক স্মিট্ বেরিয়ে পড়লেন সুমেরু আবিষ্কারে। কত খাটতে হল তাঁকে সেজন্য। বরফের সাদা রঙের মধ্যে যাতে দেখা যেতে পারে সেজন্য তিনি এরোপ্লেনের রং করলেন ঝক্‌ঝকে কমলা। এরোপ্লেনের ভেতরে সব বন্দোবস্ত করে তবে তাঁরা বেরুলেন। সঙ্গে শুকনো খাবার নেওয়া হল।

নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা কোনও রকমে সুমেরুতে পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা অনেক কিছু নতুন জিনিস শিখলেন। সে দেশের বরফের নীচে জল তেমন ঠাণ্ডা নয়। অন্য জায়গার তুলনায় বেশ গরম। সে

জলে জীব জন্তুও বাস করে। আবিষ্কারকরা যখন জল কতটা গরম তাই মাপছিলেন তখন টুপ করে এক কঁ্যাক্ড়া এল বেরিয়ে। ধর ধর সেই কঁ্যাকড়া! দূরে কি পাখী যেন আবার শিষ দিয়ে উঠল।

এদলের সঙ্গে যে বেচারী ঠাকুর গিয়েছিল রান্না করতে তার ভারী দুঃখ। সকলে এত কাজ করে নাম নিল আর সে কিনা ঘরে বসে বসে শুধ্ রান্না করেছে!

এমনি ভাবে মে দিবস এল। সোভিয়েটে তখন আনন্দের হাট বসে। ঠাকুরও অন্য সকলের সঙ্গে উৎসবে মেতেছে। এমন সময় গত বছর যারা দেশের জন্য ভাল কাজ করেছে তাদের নাম বলা হল বেতারে!

অধ্যাপক স্মিট্ এর নাম হল, তাঁর দলবলের সবাইকার নাম হল। আর ওকি? ঠাকুরের নামও যে বলছে বেতারে। সে নাকি অধ্যাপকের দলের লোককে অত ভাল যত্ন করে না খাওয়ালে তারা কেউ বাঁচতেনই না সে বেঘোরে!

সুমেরুর চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় মধ্য এশিয়ার মরুভূমির বিরুদ্ধে সোভিয়েটের যুদ্ধ! এত ভীষণ শুকনো সে সব দেশ যে সকালের খবরের কাগজে বিকেলে হাত দিলে আপনা থেকে ঝর ঝর করে গুঁড়ো হয়ে পড়ে! সেই মরুভূমির বালুর নীচে আবিষ্কৃত হল এক পুরনো শহর হাজার হাজার বছর আগের! পণ্ডিতরা ভাবলেন একবার যদি মরুতে শহর থাকতে পারে তাহলে মানুষ আবার কেন মরুকে শস্য শ্যামল করতে

পারবে না? দলে দলে এঞ্জিনীয়ার এলেন, বিজ্ঞানী এলেন, তাঁরা পণ নিলেন আমুদরিয়ার নদীকে বেঁকিয়ে মরুভূমির ভেতর দিয়ে চালাবেন। তাহলেই আবার মরুভূমি সুজলা সুফলা হবে। তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়েছে। এখন কারাকুন মরুতে ফুটছে ফুল ধরছে কত ফল! মরুবাসীরা আর যাযাবর ডাকাত নয়, তারাও এই সঙ্গে হয়েছে নতুন মানুষ!

আর পামীর। পামীরকে বলে পৃথিবীর ছাদ। সমুদ্র থেকে বহু বহু ফিট উঁচু এই মালভূমি। বছরের অধিকাংশ সময়েই এই মালভূমির পাহাড়ের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ থাকত না। আজ আর তা হবার যো নেই। পামীর মালভূমিতে আজ কত শহর গড়ে উঠেছে! তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ রয়েছে রেডিও আর টেলিগ্রাফ দিয়ে। সে সমস্ত রেডিয়োর খবরাখবর যোগাড় করে "বাদমাসোনী সূর্য্য" বলে খবরের কাগজ ছাপা হয় পামীরে। পাহাড়ের গা খুদে খুদে আঁকা বাঁকা হাজারো চূড়া ডিঙিয়ে এদেশের লোক শত মাইল লম্বা জলসেচনের জন্য খাল কেটেছে! ঘাড়ে করে শয়ে শয়ে চাষী সার ছড়িয়েছে সে দেশের জমিতে। আজ পামীরের লোক মনের সুখে আমার তোমার মতই আলু খাচ্ছে খাবারের সঙ্গে! অথচ এই সেদিন-পর্য্যন্ত তারা আলুর নাম শুনলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত!

পামীরে জলের অভাবই হচ্ছে চাষের সবচেয়ে বড় অসুবিধে। গাছ গাছড়া বেশী না হলে জমিতে জল আটকানো যায় না।

তাই পামীরের চাষীরা তিনলক্ষ গাছের চারা লাগিয়েছে। হরেক রকমের গাছ আছে তার মধ্যে। এর মধ্যে প্রায় দুই-লক্ষ গাছে গুটি পোকার চাষ হয়।

নদীতে বাঁধ বেঁধে এখন সে দেশে বিজলী সরবরাহ হচ্ছে। পামীরের রাজধানী 'খরোগ-এ' তাই দেখবে সন্ধ্যে হলেই ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে 'লেনিনের বাতি'!

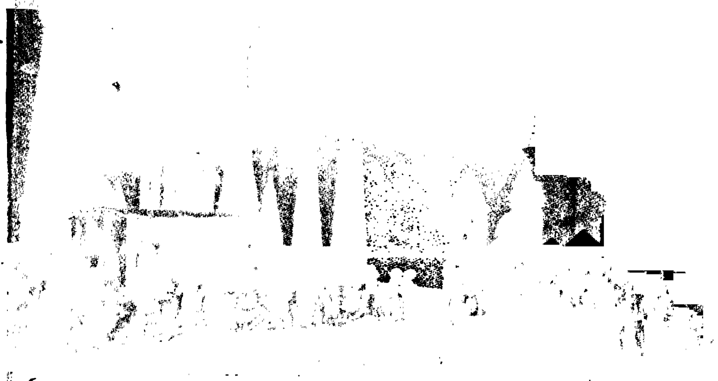
সিনেমা, থিয়েটার, গান আর বাজনা

সোভিয়েট সম্বন্ধে নানা দেশের লোকের অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। তারা বলে যে সোভিয়েটে তো খালি লোহা-লক্কড়, মোটর গাড়ী, এরোপ্লেনের কাজ হয়। মানুষগুলো হচ্ছে সেখানে যন্ত্রের মত। কিন্তু সে সমস্তই মিথ্যে কথা। সোভিয়েট দেশেও লোক গান বাজনার চর্চ্চা করে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে। বরঞ্চ অন্যদেশের চেয়ে বহুগুণ বেশী লোক করে এসব চারুকলার চর্চ্চা!

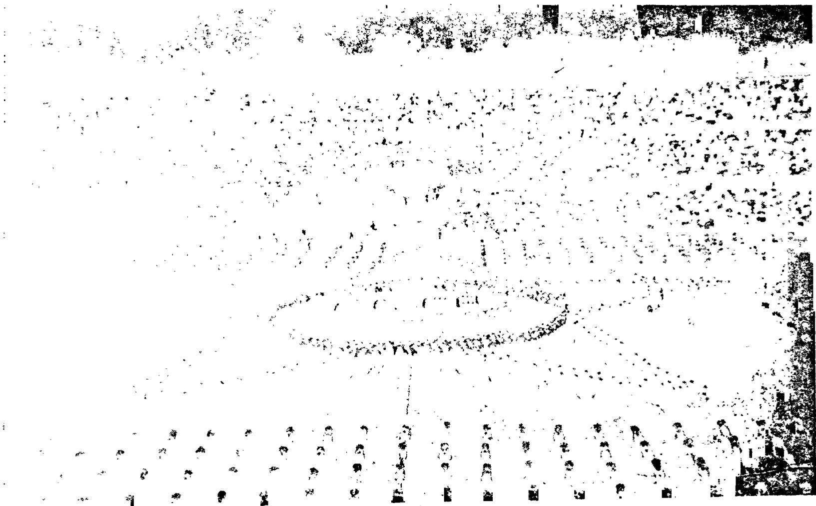
জারের আমলে শুধু মস্কৌ আর সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গে থিয়েটার অপেরার নাম ছিল। আর আজ সোভিয়েটের এমন ছোটবড় গ্রাম নেই যেখানে থিয়েটার অপেরা নেই, সিনেমা ঘর নেই! আগের যুগে শুধু ক'জন নগন্য বিলাসী যেতেন থিয়েটারে। দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ জীবনে কোনোও দিন থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখবার সুযোগ পায় নি। আজ সেখানে জনসাধারণের অবাধ অধিকার। জারের যুগে মস্কৌতে ছিল মাত্র সাতটী কি আটটী



"হিম প্রাসাদ-আক্রমণ" নাটকের একটি দৃশ্য—বিপ্লবের প্রথম সোপান



মস্কৌ-অপেরায় খোলে রঙের বাহার



খেলা-ধূলার আর এক দৃশ্য

থিয়েটার। এখন চল্লিশটী থিয়েটারে লক্ষ লক্ষ মজুর থিয়েটার দেখে। প্রত্যেক থিয়েটারেই কতকগুলি সিট আগে থাকতেই এক একটী কারখানার মজুরদের জন্য রিজার্ভ করা থাকে। তাছাড়া লালফৌজ, লাল নৌবাহিনী আর অনেক শহরের বড়বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নিজেদেরই থিয়েটার থাকে। সোভিয়েটের সবচেয়ে বিখ্যাত থিয়েটার হচ্ছে "মস্কৌ আর্ট থিয়েটার"। নেভিরোভিচ্ ডানচেঙ্কো, আর স্টানিশ্লাভস্কী নামে দুজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পরিচালক মস্কৌ আর্ট থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়া আর যে সব থিয়েটার আছে তাদেরও প্রত্যেকের অভিনয়ের ঢঙ্এ বৈশিষ্ট আছে। প্রত্যেক থিয়েটারের সঙ্গে অভিনয় শেখাবার জন্যে নিজস্ব স্কুলও আছে তাদের। আমাদের দেশে কোন অভিভাবক যদি শোনেন যে তাঁর ছেলে থিয়েটার করবে তাহলে কি অবস্থা হবে ভেবে দেখো! কিন্তু সোভিয়েটে কেউ তেমন ছেলেকে বাধা দেবেন না। সে পড়াশুনা শেষ করে সোজা থিয়েটারের স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। তারপর নিজের ক্ষমতা থাকলেই নাম করতে পারবে।

এত যে দেশময় থিয়েটার আছে তাতে কিন্তু শুধু রাশিয়ার থিয়েটার দেখান হয় না! আজকালকার সোভিয়েট জীবন নিয়ে লেখা নাটক তো বেশী চলেই। তাছাড়া পুরনো নাটকও কম চলে না। সোভিয়েট দেশের লোক সত্যি পুরনো নাটককে ভালবাসে। তার কারণ আগের যুগে যদি অত

ভাল নাটক না হত তাহলে আজকের সোভিয়েট নাটক এত উন্নত হতে পারত না। অতীতের দান না থাকলে বর্ত্তমানে কেউ বড় হতে পারে না। বিদেশী নাটকের সমঝদার রাশিয়ার মত কোনদেশ নয়। সেক্সপীয়ারের নাটক খাস লণ্ডনের চেয়ে মস্কৌতে বেশী রাত ধরে চলে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েয়ারের নাটকও সোভিয়েটের লোক খুব ভালবাসে। প্রাচীন গ্রীক, জার্ম্মান সবদেশেরই নাটক অভিনীত হয় সোভিয়েটে। ১৯৪১ সালে হিটলার মস্কৌর দুয়ার পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন। সেই দুর্দ্দিনেও মস্কৌতে ইংরেজলেখক অলিভার গোল্ডস্মিথের নাটক "শী স্টুপস টু কঙ্কার" চলছিল পুরোদমে।

দেশী বিদেশী যাঁরাই সোভিয়েট থিয়েটার দেখেছেন তাঁরাই একবাক্যে প্রশংসা করেছেন সে থিয়েটারের! শার্লোটি হলডেন নামে বিখ্যাত ইংরেজ মহিলা সাংবাদিক বলেছেন যে রাশিয়ার মত এত থিয়েটার পাগল লোক আর কোথাও দেখেন নি।

সোভিয়েট-অপেরাও বিশ্ববিখ্যাত। মুসোর্গস্কী, রিমস্কী কর্সাকভ, চাইকোভস্কী এঁরা হচ্ছেন নামজাদা গায়ক-অভিনেতা। তাছাড়া সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শীও আছেন বহু প্রতিভাশালী গায়ক! আধুনিক তরুণ গায়ক সোস্টাকোভিচ হচ্ছেন এ বিষয় সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি সঙ্গীতে দেশের শ্রেষ্ঠ স্টালিন পুরস্কার পেয়েছেন।

অভিনয়কলার একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে "ব্যালে!"

সোভিয়েট ব্যালের তুলনা নেই পৃথিবীতে। সোভিয়েটে গিয়ে অভিনেত্রী উলানোভার নৃত্যগীতে শার্লোটি হলডেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বর্গীয়া এ্যানা পাভলোভার নামও দেশ বিদেশের নৃত্য রসিকরা জানেন। তিনি কলিকাতাতেও এসেছিলেন।

সিনেমাতেও আজ সোভিয়েট ছায়াচিত্র পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সিনেমা পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছেন আইসেনস্টাইন, পুডোভকিন আর ডবঝেঙ্কো।

আধুনিক কয়েকটি নামকরা সোভিয়েট ছবি হচ্ছে মহিমময় পিটার, আলেক্‌জান্দার নেভস্কী ও জেনারেল স্নুভোরভ।

সোভিয়েট থিয়েটারের আর একটা মজা হচ্ছে যে ছোটদের জন্যে আছে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা বন্দোবস্ত! তাদের জন্যে আলাদা থিয়েটার আছে, নামজাদা অভিনেতা, অভিনেত্রী আছে তাদের। এসমস্ত অভিনেতাদের নিজের মত যে, বড়দের চেয়ে ছোটদের নাটকে কষ্ট করতে হয় অনেক বেশী।

এ সব থিয়েটারের মধ্যে দিয়েও ছোটদের অনেক জিনিস শেখানো হয়। তারা শেখে যে পৃথিবীতে হাজার হাজার জাতির মানুষ বাস করে, তাদের কাউকেই ঘৃণা করতে নেই। নিজের মত করেই অন্য সবাইকে ভালবাসতে হয় তাদের! এমনি এক থিয়েটারের গল্প শোনো ঃ

এটা ছোটদেরই থিয়েটার—তারাই রেস্তরাঁ চালায়।

সমস্ত দেয়াল জুড়ে তাদের আদরের অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফটো! রেস্তরাঁর মাঝখানে সাজানো আছে কাচের বাক্স ভর্তি নানা রকমের খেলনা আর পুতুল।

প্রায় দেড়হাজার ছেলে দেখতে এসেছে থিয়েটার। কিন্তু কোথাও অবাধ্যতার লেশও নেই! নাটকের নাম হচ্ছে "নিগ্রো ছেলে আর একটি বাঁদর!"

প্রথম দৃশ্য হচ্ছে আফ্রিকায়। একপাল কাফ্রী ছেলেমেয়েরা খেলছে। খেলতে খেলতে শুরু হল মারামারি কাটাকাটি। শেষে সবাই বিরক্ত হয়ে বলল—"আঃ আমাদের একজন নেতা থাকলে কেমন মজা হত, না?"

ওদেরই একজন এগিয়ে এসে বলল—"বেশ তো এসো না যে সবচেয়ে ভাল লাফাতে পারবে, দৌড়তে পারবে, গাইতে পারবে তাকেই আমাদের নেতা করা যাবে!" অমনি প্রতিযোগিতা হল। আর সে সব তাতেই ফার্স্ট হওয়ায় তাকেই নেতা করল সবাই।

তারপরে তারা বেরুল শিকারে। সেখানে আর একটু হলেই পাইথন সাপের হাতে ছেলেটির প্রাণ যেত। ঠিক সেই মুহুর্ত্তেই একটা বানর লাফিয়ে পড়ে তাকে বাঁচিয়ে দেয়। বানরটির সঙ্গে তখন থেকে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হল! এরপর এল একদল শোষক। তারা বন জঙ্গলের স্বাধীন জীব ধরে নিয়ে সার্কাস দেখিয়ে পয়সা রোজগার করত। তাদের হাত থেকে নিগ্রো ছেলে মেয়েরা পালিয়ে বাঁচল কিন্তু তাদের

অত আদরের বানরটি ধরা পড়ল। তারা বানরটিকে চালান করে দিল। কোথায় গেল বানরটা? সে জাহাজে উঠতে না পেরে নিগ্রো ছেলেটি আর এক জাহাজে চড়ে চলল বানর খুঁজতে। জাহাজ এল মস্কৌতে। পরের দৃশ্যে দেখা যাবে যে সে ছেলেটি মেস্কৌর এক চকোলেট কারখানায় কাজ করছে। খাবার ঘণ্টা পড়লে সবাই যখন খেতে চলে গেল তখন সে পড়ে রইল একা। কারখানায় আফ্রিকার ম্যাপ জড়িয়ে ধরে তার কি কান্না! এমন সময় দুদিক দিয়ে দুজন কমসোমল আসবে তার কাছে। তারা আদর করে তাকে দেবে সে রাত্তিরের একটা সার্কাসের টিকিট। এবার বিশ্রাম।

বিশ্রামের পর সেই নিগ্রো ছেলেটি আর বন্ধু দুজন কমসোমল দর্শকদের ভেতর এসে বসে সার্কাস দেখতে লাগল। সার্কাসের দলের মধ্যে রয়েছে নিগ্রো ছেলেটির বন্ধু সেই বানর। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে চিমসে গেছে তার শরীর। দেখলেই মায়া হয়। খেতে না পেয়ে সার্কাস করে কি করে? কিন্তু ম্যানেজার তা শুনবেন কেন? তিনি সপাং করে চাবুক মারলেন বানরটাকে!

নিগ্রো ছেলেটী তার বন্ধুর ওপর এ অত্যাচার সহ্য করতে পারল না। বুক ফাটানো চিৎকার করে সে বানরটাকে নাম ধরে ডাকল। বানরটীও একলাফে সার্কাসের শিকের ঘেরা টপকে তার কাছে চলে এল। দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে আবার হল মিলন। সমস্ত ঘর ভেঙে পড়ল হাততালিতে।

এবার একটু অন্ধকার। তারপরে এক জাহাজ চলেছে আফ্রিকায়। শেষ দৃশ্যে আছে আবার সেই আফ্রিকার জঙ্গলে খেলা। নিগ্রো ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। তাদের মধ্যে ফিরে এল হারানো নেতা আর তার প্রিয় বানর! তারা খালি হাতে আসে নি। সোভিয়েট ছেলে মেয়েরা দিয়েছে তাদের দুহাত ভর্ত্তি করে উপহার? নেতা সেই উপহার দেওয়ার সময় বলল এই নাও ভাই মস্কোর ছেলেরা আমাদের আঁধার জঙ্গলের বন্ধুদের পাঠিয়েছে এগুলো। নিগ্রোই হক কি রেড্ইণ্ডিয়ান কি অন্য যে কোন জাতের ছেলেই হক না কেন মস্কোর ছোট ছেলেরা চায় যে সবাই যেন তাদের মত আনন্দ করতে পারে জীবনে।

তুমি আমি তো দূরের কথা, এ থিয়েটার দেখে বিলেতের বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক (মহাত্মা গান্ধী বিলেত গিয়ে এঁর এখানে ছিলেন) ডীন অফ কাণ্টারবেরী কি বলেছিলেন জানো? “থিয়েটার দেখে ফেরবার সময় ভাবাবেশে আমার গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবলাম এটি নাম করা কমিউনিস্ট থিয়েটার। কমিউনিস্ট অভিনেতারা অভিনয় করছেন কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের জন্য। আর আজ হল রবিবার, পবিত্র দিন একটা সপ্তাহের। আমার সারা জীবনের খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের আদর্শ এমন সহজ করে বলতে আর কোথাও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হল আমার খ্রীষ্টীয় আদর্শকে আজ যেন এরা সত্যিকার রূপ দিয়েছে।”

খেলাধুলা

সোভিয়েট দেশে সরকার থেকেই খেলাধূলার তদারক করা হয়। সরকারেরই কর্ত্তব্য হচ্ছে দেখা কি করে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তা না হলে তারা কাজই বা করবে কেমন করে—আর যুদ্ধ বিগ্রহেই বা জিতবে কি করে?

দেশের যেখানে যত খেলাধূলার সমিতি আছে তাদের কাজ কর্ম্ম দেখাশুনার জন্যে মাথার উপর এক কমিটি আছে।

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে এমন কি সৈন্যবাহিনীতেও রয়েছে খেলার সব ক্লাব। প্রায় এক কোটি লোক নিয়ম করে খেলায় যোগ দেয়।

প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই পরীক্ষা দিতে হয় তাদের নিজের নিজের খেলায় পারদর্শীতা দেখাবার জন্যে! দৌড়নো, লাফ দেওয়া, সাঁতারকাটা, নৌকা চালানো, গুলী-ছোঁড়া এ সব বিষয়ই প্রধান। ছোটদের জন্য আলাদা পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যারা ভাল করে তাদের ব্যাজ দেওয়া হয়।

খেলার জন্য আছে ৬৫০টী বড় বড় স্টাডিয়াম, ৭২০০টী

খেলার মাঠ, ১০০শত শরীর চর্চ্চার ক্লাব, ৩৫০টী সাঁতারের ক্লাব। এবং ১৯৩৭ সালেই সরকার ক্লাব থেকে খেলাধূলার পেছনে খরচ করা হয়েছিল ৬০কোটি রুবল।

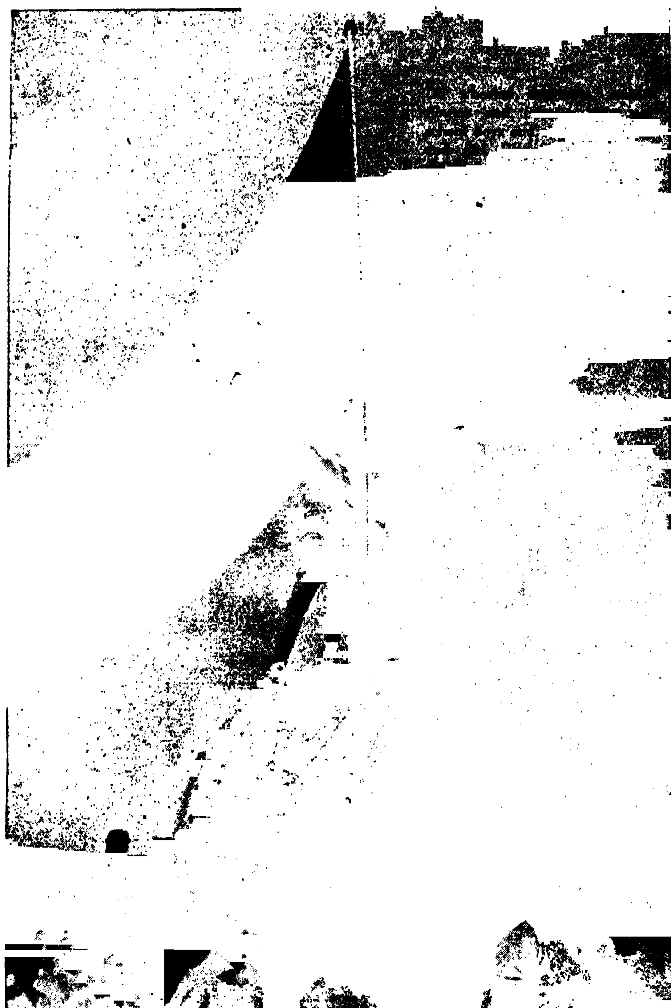
জমকালো খেলার দিন মস্কৌর ডাইনামো স্টাডিয়ামে লোক হয় প্রায় ৭৫০০০। মস্কৌর আর একটি স্টাডিয়াম তৈরী করা হচ্ছে। তাতে দেড়লক্ষ লোক বসতে পারবে!

যে কোন লোকই খেলাধূলার ক্লাবের সভ্য হতে পারে। তাকে একটা সামান্য চাঁদা দিতে হয় সেজন্যে। সোভিয়েটে যারা খেলাধূলায় নাম করে তাদের অন্য কাজও করতে হয়। খেলাধূলায় যোগ দেবার সময় কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

ফুটবল, হকি, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, সাইক্লিং, ভলিবল, বাস্কেটবল, বক্সিং, রাগবী, ঘোড়ায় চড়া—কিছুই বাদ যায় না।

খেলাধূলা এত আদরের জিনিস সে দেশে যে বাড়ীসুদ্ধ সবাই তাতে যোগ দেয়। একটি পরিবারের মা যোগ দিয়েছিলেন—৫৫০ গজ দৌড়ে। তিনি দেড় মিনিটে দৌড়েছিলেন। তাঁর বয়স ছিল তখন পঞ্চাশ। তাঁর বড় মেয়ে ১১০০ গজ দৌড়ে প্রথম হয়েছিলেন। এক ছেলে ৩৩০০ গজ দৌড়ে প্রথম হয়, আর একজন ছেলে ৫৫০০ গজ দৌড়ে প্রথম হয়েছিল। ফলে সমস্ত পরিবারকেই একটি বিশেষ প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল।

মধ্য এশিয়ার আস্কাবাদ থেকে মস্কৌ হচ্ছে ছ'হাজার মাইল-এরও উপর। অতদূরের পথে ঘোড়ায় চড়ার প্রতিযোগিতা



ফুলের তোড়া হাতে পাইওনীয়ার দলের ছেলে মেয়েরা—ওপরে সোভিয়েটের
উদার উন্মুক্ত আকাশ আর তারই নীচে প্রিয়তম নেতা
লেনিনের ছবি ও সোভিয়েটের রক্ত পতাকা।



সারা সোভিয়েটের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দৃশ্য-পতাকা নিয়ে সবাই আসছে



ছোটদের পুতুল খেলার ঘর।

হয়েছিল। তেমনি হয়েছিল ১৬ হাজার মাইল সাইক্লিং-এর আর ৬ হাজার মাইল স্কী করার!

গরমের সময় প্রত্যেক বছর মস্কৌর লালস্কোয়ারে সারা সোভিয়েটের খেলাধূলার উৎসব হয়। স্টালিন ও অন্যান্য নেতারা হাজির থাকেন তাতে।

ধর্ম্ম চর্চ্চা কি সোভিয়েটে বারণ ?

সোভিয়েট দেশের লোক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি ভাবে বলতে পার ? এ নিয়ে হাজার রকমের গুজব ছড়িয়ে আছে বাজারে। কেউ বলে যে সোভিয়েটে ধর্ম্ম বলে কোন জিনিসই নেই। আবার কেউ বলে যে আছে।

বিপ্লবের আগে গোঁড়া গ্রীক চার্চ্চের ভক্ত ছিলেন জার। খ্রীস্টান ধর্ম্মই ছিল রাজধর্ম্ম। কিন্তু রাশিয়া এশিয়া ইউরোপ দুদেশ জুড়ে রয়েছে কিনা—তাদের কোটি কোটি লোক সবাই তো খৃষ্টান ছিল না।

রাজধর্ম্ম ছাড়া অন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। সবচেয়ে বেশী অত্যাচার হত ইহুদীদের ওপর। ইহুদী ছাড়া মুসলমান, বৌদ্ধ ও আদিম ধর্ম্ম বিশ্বাসী লোকও ছিল রাশিয়াতে। তারা কোনও মতে নিজেদের ধর্ম্ম বিশ্বাস বাঁচিয়ে চলত। সামান্য কারণে তখন বেধে উঠত সম্প্রদায়িক কলহ। কত লোক যে খুন জখম হত সে সব দাঙ্গা হাঙ্গামায়!

নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ছাড়াও মোল্লা আর পাদ্রীদের উপদ্রবে নিরীহ ধর্ম্মবিশ্বাসীদের হত প্রাণান্ত। সবাই মিলে চালাত শোষণ। গরীবরা মাথা তোলবার, স্বাধীনতার কথা ভাববার সুযোগই পেত না।

আমাদের দেশের কোন মন্দিরের পাণ্ডার জুলুম যদি দেখে থাক তো রাশিয়ার অত্যাচারের কথা বুঝতে পারবে সহজে। ধর্ম্মের নাম নিয়ে গরীবদের ঠকানো হল পাণ্ডা পুরোহিতদের এক প্রধান কাজ। গরীবরা যাতে মাথা তুলতে না পারে সে জন্যে তাদের শেখানো হয় যে এ-জীবনে যে যত কষ্ট করবে পরের জীবনে সে তত সুখে থাকবে। সত্যিকার অবস্থা ভুলিয়ে রাখে বলেই মার্ক্স বলেছিলেন ধর্ম্ম হল গরীবদের কাছে আফিমের মত।

বিপ্লবের নেতা বলশেভিকরা সবাই ছিলেন মার্ক্সের শিষ্য। তাঁরা বলতেন যে মানুষ যতদিন জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত না হবে ততদিন তাদের এ রকম ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশ্বাস থাকবেই। তাই তাঁরা একটা বিষয় ঠিক করলেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ রাখবেন না। সব ধর্ম্মই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে সোভিয়েটে। আর তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন যেন কেউ ধর্ম্মের নামে অত্যাচার না করে কারুর উপর।

রাশিয়ার পাদ্রীরা গরীবদের ওপর কেমন অত্যাচার করত শোনো। ১৯০৫ সালে একবার গরীবরা জারের কাছে এক আবেদন নিয়ে গিয়েছিল। কশাক সৈন্যরা সেই জনতাকে

ঘিরে নির্ম্মম ভাবে গুলী করে মেরেছিল। যারা প্রাণ নিয়ে ফিরেছিল তাদের লক্ষ্য করে একজন নামজাদা পাদরী বলেছিলেন ঃ

"ভাই সব যারা বলে যে পৃথিবীতে ধনী গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ দূর করা সম্ভব তারা বদ্ধ পাগল। তাদের কথা শুনো না। বড়লোকের ধন সম্পদকে ঈর্ষা করে বলে আর সব সময় ভগবানের কাছে নালিশ করে বলেই ভগবান গরীবদের পৃথিবীতে পাপী করে পাঠিয়েছেন।"

এর ওপর কোন মন্তব্য দরকার করে কি?

রুশ সাম্রাজ্যে তখন ছিল ৫৭, ১৭৩ গির্জ্জা, ৫৫০ টি মঠ, ৪৭৫ কনভেণ্ট! গীর্জ্জাগুলোর বছরে মোট আয় ছিল ৫০ কোটি রুবল! বিপ্লবের পর বলশেভিকরা সমস্ত ব্যাঙ্কের টাকা কেড়ে নিয়েছিল। তাতে গীর্জ্জার জমা ছিল ৮০০ কোটি রুবল!

ধার্ম্মিকদের জন্য এক নতুন আইন তৈরী হল। এতে বলা হল যে সোভিয়েট দেশের যে কোন লোক যে কোন ধর্ম্ম মেনে চলতে পারে। কারুর ধর্ম্ম মতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তবে সরকার থেকে আর কোনও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হবে না। ধার্ম্মিকদের নিজেদের চাঁদা দিয়ে সব গীর্জ্জার খরচ চালাতে হবে। শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত করলেই ধার্ম্মিকরা ব্যবহারের জন্য গীর্জ্জা পাবে।

তবে তাঁরা গীর্জ্জার সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নেন।

গীর্জ্জার স্কুলও বন্ধ করা হয়। সেই সঙ্গে ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও প্রচার করার অধিকার দেওয়া হয় সবাইকে।

এদিকে বলশেভিক বিপ্লবে সহায় সম্পত্তি লোপ পেতে দেখে গোঁড়া আর অত্যাচারী পাদরীর দল বিপ্লবের বিরোধীতা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারা প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লব বিরোধী দলে যোগ দেওয়ায় সরকার থেকে তাদের দমন করা হয়। তাদের ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সোভিয়েট শাসনের আমলে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে দেশের এই বিপ্লববিরোধী পাদরীরা আবার দেশের সেবায় যোগ দিয়েছেন। কাজেই ১৯৩৬ সালের নতুন গঠনতন্ত্রে তাঁদেরও ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ধার্ম্মিক খ্রীস্টান, ইহুদী, মুসলমানদের ওপর সোভিয়েট সরকার অত্যাচার করে যারা বলে তারা মিথ্যে গুজব রটনা করছে। হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্রীস্টান, মুসলমান সবাই স্টালিনের নেতৃত্বকে মেনে লক্ষে লক্ষে প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধে। গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় লেনিন, স্টালিন, টিমোশেঙ্কোর ছবি ঝুলছে দেখবে।

পাদ্রী আন্দ্রেইর কাহিনী শোনো! জার্ম্মানরা তাঁর গ্রাম দখল করে নিয়েও প্রায় মাসখানেক তাঁর ওপর কোন অত্যাচার করে নি। তবে এর পর থেকেই ক্রমে এক একটা করে গীর্জ্জার জিনিসপত্তর তারা সরাতে থাকে। তারপর এক রবিবারে উপাসনা করতে এসে তিনি দেখলেন

যে একদল জার্ম্মান সৈন্য গীর্জ্জার সব কিছু তছনছ করে ফেলেছে। প্রতিবাদ করতে যেতেই জার্ম্মান সেনাপতি ধমকে উঠলেন। ওটা তাদের ঘোড়ার আস্তাবল হবে।

সে রাতেই আন্দ্রেই পালিয়ে গেলেন এক জঙ্গলে। প্রায় সব জঙ্গলেই তখন থাকত রুশ গেরিলারা। তিনি তখনি এক গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু প্রথমে গেরিলারা তাঁকে করত সন্দেহ। পরে অনেক ছোটখাট কাজ দিয়ে তাঁরা তখন বুঝলেন যে তিনি সত্যি খাঁটী লোক—তখন তাঁকে রীতিমত বড় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হতে থাকে।

একবার দলটিকে নাৎসীরা ঘিরে ফেলেছিল। আর বেরুবার পথ প্রায় কেউই জনতেন না। তখন অসমসাহসী আন্দ্রেই কি করে যেন সবাইকে উদ্ধার করেছিলেন। সে যুদ্ধে গেরিলা সেনাপতি মারা যান। নতুন সেনাপতি করবার সময় সবাই ভোট দিল পাদ্রী আন্দ্রেইর পক্ষে।

ক্রমে ক্রমে গেরিলাদের দল আরও ভারী হল। তারা অনেক বীরত্বের কাজ করে বিখ্যাত হয়ে পড়ল দেশে। অবশেষে একদিন সে-দলের নেতাদের ডাক পড়ল লেনিনগ্রাদে।

প্রধান সেনাপতি গেরিলাদলের নেতাকে "লেনিনের পদক" উপহার দিল। কথার ফাঁকে তিনি আন্দ্রেইকে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে বললেন। নাৎসীরা ঐ দাড়িওয়ালা মুখ দেখলে দূর থেকেই চিনতে পারবে তাঁকে। তিনি তো জানতেন না যে আন্দ্রেই একজন পাদ্রী।

কিন্তু আন্দ্রেই বললেন যে না তিনি দাড়ি কামাবেন না। যুদ্ধ থেমে গেলে আবার দাড়ি তো কাজে লাগবে। •

প্রধান সেনাপতি অবাক! বললেন "সে কি? কি কাজে লাগবে আপনার দাড়ি?"

"কেন—আমি যে পাদরী। হিটলার আমার দেশ দখল করতে এসেছে—আমাদের গীর্জ্জা অপবিত্র করেছে—তাইতো আমি চাইছি এর প্রতিবিধান করতে।"

আন্দ্রেই শুধু একজন। এমনি লক্ষ লক্ষ পাদ্রী যোগ দিয়েছিলেন তাদের দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে।

লালফৌজ

সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোক লালফৌজ সম্বন্ধে নানা গুজবে বিশ্বাস করত।

১৯৩৮ সালে মার্শাল তুকাচেভস্কী ও আরও অনেককে দেশদ্রোহীতার জন্য ফাঁসী দেওয়া হলে সমস্ত পৃথিবীশুদ্ধ বড়লোকদের খবরের কাগজ একবাক্যে বলতে লাগল ?

"গেল রাশিয়ার সব গেল তুকাচেভস্কীই যদি না রইল তো যুদ্ধে করবে কে ? "

আবার ফিনল্যাণ্ডের হঠকারিতায় যখন তার সঙ্গে লালফৌজকে লড়তে হল—তখন সেই সব বড়লোকদেরই কাগজ প্রচার করল,

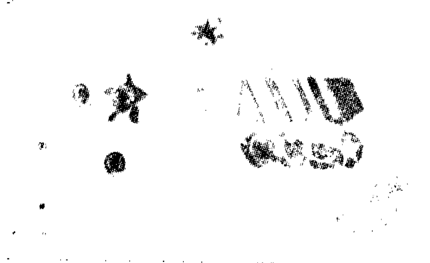
"ছিঃ ছিঃ সামান্য ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যে যুদ্ধে জিততে এত দিন লাগায় তার কেরামতি বোঝা গেছে। রাশিয়া যুদ্ধ করতেই জানে না—তাই তো আমরা কেউ ওর সঙ্গে যোগ দিই নি।"

যুদ্ধের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমরা অনেকে খবরের কাগজ



দুই সেনাপতি—স্টালিন ও ভরোশিলভ

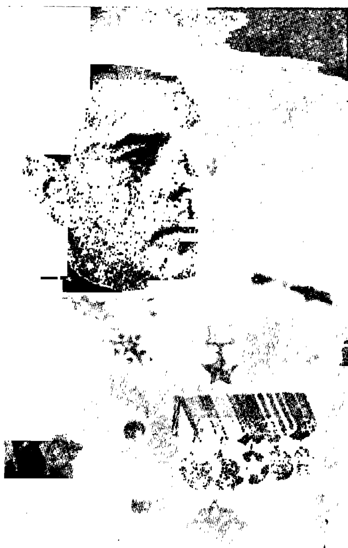




মার্শাল সাপোশনিকভ



মার্শাল জুকোভ—
এ যুদ্ধের সেরা সেনাপতি



মার্শাল ভ্যাসিলিয়েভস্কী
জাপানকে ইনিই হারিয়েছেন
মাঞ্চুরিয়ায়।

পড়েছো। পর পর অনেকবার যুদ্ধে হেরে অবশেষে হিটলার একদিন বলেছিলেন যে ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধটা ছিল' রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ধাপ্পাবাজী!

কিন্তু তখন আর জার্ম্মানীর পিছিয়ে আসবার উপায় ছিল না। রাশিয়ার লালফৌজের কাছে নাজীরা বেদম মার খাচ্ছিল তখন। একদিন যে সব খবরের কাগজ রোজ সেভিয়েটের লালফৌজ সম্বন্ধে জেনেশুনে মিথ্যে খবর রটাত তাদের বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল যে লালফৌজের মত সেনাদল পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় নি আজ পর্য্যন্ত।

১৯১৮ সালের ২৩শে ফেরুয়ারী লেনিন লালফৌজ সংগঠনের আদেশ দেন। তখন রাশিয়ার বুকে চলছিল বহু ধনিক দেশের আক্রমণ আর দেশদ্রোহীদের বিদ্রোহ। লেনিনের গড়া লালফৌজ তখন তাদের বাধা দিয়েছিল পদে পদে। রাইফেল কাঁধে করে লালফৌজও যেমন শতদুঃখ কষ্ট বরণ করে যুদ্ধে এগিয়েছে, তেমনি দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক গেরিলা দলে যোগ দিয়েছিল তখন। আর্কটিক মহাসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত, প্রত্যেক অঞ্চলেই গেরিলারা যুদ্ধ করেছিল। ধরা পড়লে যে আর রক্ষে থাকবে না এমন জেনেও গেরিলার দলে যোগ দিতে কেউ ইতস্ততঃ করে নি তখন। অন্তর্যুদ্ধের সময়কার গেরিলার বীরত্ব কাহিনী আজও লাল-ফৌজের গর্ব্বের বিষয়।

অন্তর্যুদ্ধ শেষ হলে লালফৌজ গড়ার কাজ আরম্ভ হয় নতুনভাবে। সমস্ত ধনিকদের দেশে সৈন্য বিভাগেও বড়ছোট ভেদাভেদ আছে। কিন্তু সোভিয়েটে তা নেই। যে কোন অবস্থা থেকেই সৈন্যের প্রমোশন হতে পারে। অন্যদেশের সেনাপতি কি অফিসাররা কখনো সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেননা পাছে তাদের সম্মান হানি হয়। কিন্তু কাজের সময় ছাড়া সোভিয়েটের অফিসার আর সাধারণ সৈন্যের কোনই ভেদাভেদ থাকে না। তারা একই জায়গায় খায় একই ক্লাবে খেলাধুলা করে।

অন্যদেশের সৈন্যেরা বেশীরভাগই লেখাপড়া জানে না। কিন্তু সোভিয়েটের সৈন্যরা সবাই শিক্ষিত। রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, মার্ক্সবাদ সব কিছুই তাদের খুব ভালকরে শেখানো হয়। কাজেই প্রত্যেক লালফৌজ জানে যে সে কিসের জন্য যুদ্ধ করছে।

তাছাড়া দেশবিদেশের সৈন্যরা অশিক্ষিত বলে ভদ্র লোকেরা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সাহস পায় না! তোমরাও তো এখন কত দেশের সৈন্য দেখছো বাংলা দেশে। তাদের অনেকেই ভদ্র নামের যোগ্য নয়। কিন্তু সোভিয়েটে তা হবার উপায় নেই। সে দেশের সবাই লালফৌজকে খুব ভালবাসে। তারা জানে যে লালফৌজ সত্যিই খুব শিক্ষিত আর ভদ্র! একটা গল্প বলি শোনো!

পাঞ্জাবের এক বৃদ্ধ শিখ সোভিয়েটে ছিলেন বহুদিন।

তাঁর নাম হচ্ছে নিধন সিংহ। ১৯৪৪ সালে তিনি এদেশে ফিরে কলকাতায় এক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাতে লালফৌজের প্রশংসা করতে গিয়ে যে গল্প করলেন সেটাই বলছি তোমাদের।

তিনি মস্কোর কাছেই এক গ্রামের দিকে বেড়াচ্ছিলেন। তখন সন্ধ্যা হব হব। গ্রামের পথেই একটা জঙ্গল রয়েছে বেশ গভীর। তার একটু আগেই চলছিলেন এক তরুণী। তিনি আরও অনেক দূর যাবেন। জঙ্গল শেষ হবার আগেই সন্ধ্যে হতে দেখে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। নিধন সিং এগিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে যাবার আগেই তরুণীটি দূরে এক লালফৌজের সৈনিককে দেখতে পান। লালফৌজটী কাছে এলে তাকে তরুণী জিজ্ঞেস করলেন গন্তব্যের কথা। উত্তরে শুনলেন যে লালফৌজটিও যাবেন তরুণীর গ্রামের দিকেই। তিনি ফিরে নিধন সিংকে ধন্যবাদ দিয়ে লালফৌজের সঙ্গে চলে গেলেন।

সেভিয়েট ছাড়া অন্য কোনও দেশের তরুণী এভাবে একা সেই সৈন্যের সঙ্গে যেতে সাহস করত না।

লালফৌজের যেমন শিক্ষা তেমনি চরিত্র দুই খুব উন্নত। তাদের সবসময় যোগাযোগ রাখতে হয় দেশের লোকের সঙ্গে। বেশীর ভাগ চাষীর ঘরের ছেলেরাই লালফৌজে যোগ দেয়। যোগ দেবার আগে তারা থাকে গেঁয়ো, অপরিষ্কার, আর ক্যাবলা। কিন্তু লালফৌজের শিক্ষা পেয়ে তারা

ফিরে আসে রীতিমত ভদ্রলোক হয়ে। সে জন্য ওদেশের লোক লালফৌজকে আদর করে বলে চাষীদের বিশ্ববিদ্যালয়! যুদ্ধ বিদ্রোহ না থাকলে লালফৌজ গ্রামে চাষবাসে সাহায্য করে, শহরে ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যও বাদ যায় না!

লালফৌজে লোক ভর্ত্তি করিবার নিয়মও সোভিয়েটে ভিন্ন ধরনের। সবদেশে সরকার থেকে একটা বিশেষ বয়সের লোককে সৈন্যদলে যোগ দিতে আদেশ দেয়। তার আর নড় চড় হয় না! সোভিয়েটে যখন কোথাও থেকে সৈন্য যোগাড় করতে হয় তখন অফিসাররা গিয়ে সেখানে সভা ডাকে। সে সভায় যারা যুদ্ধে যোগ দিতে পারে—তারা, আর তাদের অভিভাবক সবাই আসে! তাদের সঙ্গে সৈন্য জীবনের সুখ সুবিধা অসুবিধা সব খোলাখুলি আলোচনা করার পর নাম নেওয়া হয়। যদি কারুর ধর্ম্ম যুদ্ধে যোগ দেওয়া নিষেধ করে তাহলে সে ইচ্ছে করলে নাম না দিতে পারে। লোকের ধর্ম্মের ওপর এত সম্মান অন্য কোন দেশ দেয় নি আজ পর্য্যন্ত। কিন্তু পর পর কয়েক বছর একজন লোকও ধর্ম্মের দোহাই না দেওয়ায় ১৯৩৯ সালে এ নিয়ম তুলে দেওয়া হয়েছে।

দু'বছরের জন্য প্রত্যেককেই যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয় সোভিয়েটে! ধর্ম্মের দোহাই ছাড়াও অনেককে বাদ দেওয়া হয়। যারা পরিবারের মাত্র একাই রোজগার করে তাদের সেনাদলে নেওয়া হয় না!

লালফৌজের সৈন্সরা নির্ব্বাচনে ভোটও দিতে পারে আবার ইচ্ছে করলে নিজেরা পড়াতেও পারে।

লালফৌজের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশী, সেজন্য আলাদা একদল লোকই থাকে প্রত্যেক সৈন্যদলের সঙ্গে। তাদের নাম হল "রাজনৈতিক পরামর্শ দাতা" তারা সেনাপতির সমান ক্ষমতা রাখতো। তাদের সই নাহলে কোনও কাজ হতে পারত না। ১৯৪২ সালের পর এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৮ সালে সোভিয়েটে ছিল ১৪টি যুদ্ধবিদ্যা শেখার স্কুল আর ছটি সামরিক ফ্যাকালটী! বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটা অঙ্গ ছিল এগুলি। এ ছাড়াও নৈশ বিদ্যালয় আর চিঠিপত্রের ক্লাশ ছিল অনেক! এসব ক্লাশের ছাত্রদের পড়বার সময়েও পুরো মাহিনা দেওয়া হয়। যে কোন ছাত্রই পরীক্ষার ভাল ফল দেখিয়ে ইচ্ছা করলে অফিসার হবার সুযোগ পেতে পারে।

লালফৌজে মেয়ে সৈনিক নেই কোনো। এ যুদ্ধের মধ্যে অনেক দেশের কাগজেই ভুল করে খবর দিয়েছে যে সোভিয়েট মেয়ে বাহিনী বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে যুদ্ধ করছে। কিন্তু তা সত্যি নয়। শার্লটি হলডেন নিজে সব ভালকরে দেখে এসে বলেছেন যে সত্যি কোনও মেয়ে সৈনিক নেই সে দেশে। তবে গেরিলা-দলে বহু মেয়ে যোগ দেয়। তারা অনেক বীরত্বের কাজ করে বলে সরকার থেকে তাদের সম্মানের খেতাব দেওয়া হয়।

লালফৌজের সৈন্যদের মাহিনাও খুব ভাল। কেউ যুদ্ধে মারা গেলে তার পরিবারকে সরকার থেকে ভাতা দেওয়া হয়।

লোকবলের দিক থেকে লালফৌজ যেমন বলীয়ান তেমনি অস্ত্রশস্ত্রও কম নয় তাদের।

প্রায় দশ বছর আগে ১৯৩৫ সালে কিয়েভ শহরে লাল-ফৌজের এক সামরিক প্রদর্শনী হয়েছিল। তখন সেনাপতি-মণ্ডলীর কর্ত্তা বলেছিলেন যে লালফৌজই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী যান্ত্রিক! ট্যাঙ্কে তার আর কোন জুড়ি নেই। জার্ম্মান সেনাপতি মণ্ডলীর জেনারেল গুদেরিয়ান বলেন যে দশ হাজার ট্যাঙ্ক দেড়লাখ সামরিক ট্র্যাক্টর, একলাখ সামরিক মোটর থাকায় লালফৌজের সঙ্গে ইউরোপের কাউকেই পারতে হবে না।

হিটলারী আমলের শেষে সেনাপতিদের মধ্যে এক বিদ্রোহ হয়েছিল। তারপর এই সেনাপতি গুদেরিয়ান হয়েছিলেন জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ। কাজেই তাঁর কথার দাম আছে যথেষ্ট।

রুশ সেনাপতিরা স্পেনের বিপ্লবের সময় অনেকে গণতন্ত্রী স্পেনের দলে যোগ দিয়ে জার্ম্মানী আর ইটালীর যুদ্ধের নূতন কৌশল শিখেছিলেন। জাপানের যুদ্ধকৌশল শিখেছিলেন তাঁরা মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে লড়াই করে। রাশিয়াকে জব্দ করার ইচ্ছে জাপানের অনেক দিন থেকেই। সুযোগ বুঝে সে একবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চোরের মতন মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে। লালফৌজ ঘুমিয়ে থাকে না। এখন যিনি মার্শাল জুকোভ তিনি তখন শুধু জেনারেল। তাঁর উপর ভার পড়ে

জাপানী দমনের। এমন কায়দায় তিনি সৈন্য চালনা করেন যে জাপানীরা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি তাদের একেবারে ঘিরে ফেলে ধ্বংস করেন। সেই এক যুদ্ধেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার জাপানী মারা গিয়েছিল। তারপর থেকে আর জাপানীরা লালফৌজের সঙ্গে লড়তে সাহস করে নি। এমন কি ইউরোপে যখন হিটলার জিতছিল তখনো তারা সোভিয়েটকে ঘাঁটায় নি।

প্রত্যেক বছর পয়লা মে আর সাতই নভেম্বর লাল ফৌজের শক্তির প্রদর্শনী হয় মস্কৌতে। প্রথমে থাকে লোহার টুপী মাথায় পদাতিক; তাদের বেয়নেটের ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে ঝক ঝক করে। তারপরে আসে গ্যাস, রাসায়নিক ও পুল বাঁধাই করার দল, শ্যাপার মাইনার! তারপর আসে গোলন্দাজ বাহিনী! স্টালিন গোলন্দাজ বাহিনীকে বলেন যুদ্ধের দেবতা! সত্যি এবারকার যুদ্ধে জার্ম্মান ট্যাঙ্ককে শায়েস্তা করেছে শুধু সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী! কুর্স্ক আর ওরেলে ১৯৪৩ সনের গ্রীষ্মে জার্ম্মানী তার সমস্ত ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে লালফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সোভিয়েট তরফে প্রথম তিন চার দিন একটা ট্যাঙ্ক বেরোয় নি। তারা করেছিল শুধু গুলীবৃষ্টি! সে গুলীবৃষ্টি ভেদ করে এগোনো ছিল অসাধ্য! সে যুদ্ধে একদিনে যত গুলী ছোঁড়া হয়েছিল তা গত বিশ্বযুদ্ধের মোট গুলী ছোঁড়ার প্রায় সমান।

গোলন্দাজ বাহিনীর পরে আসে ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কেরই বা বাহার কত রকমের। এমন ট্যাঙ্ক আছে যারা জলে স্থলে সমান কাজ করতে পারে। আকাশে ওড়ে হাজার হাজার এরোপ্লেন! লাল স্কোয়ারে মহড়া দেখায় লাল আর নীল রঙএর পোশাক পরা কশাক অশ্বারোহী বাহিনী!

সোভিয়েট শীতের দেশ। তাই তারা শীতের যুদ্ধের জন্য তৈরী করেছে আশ্চর্য্য সব অস্ত্র। গরম ট্যাঙ্ক আছে তাদের! শীতের দিনে যাতে না জমে যায় এমনি রাইফেল আছে লক্ষ লক্ষ; উড়োজাহাজে টানা শ্লেজ গাড়ীরও শেষ নেই। তাদের পোশাকও শীতের উপযোগী!

উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে সোভিয়েট বহু নতুন জিনিস করেছে। তারাই প্রথম দেখিয়েছে যে উড়োজাহাজে করে সৈন্যচলাচল করানো যায়। সৈন্য পাঠানোর কৌশল সোভিয়েটের নিজস্ব। এদের উড়োজাহাজের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছে ইয়াক, আর স্টর্মোভিক!

যারা গড়ে তুলল এই অজেয় লালফৌজ, তারা অতি সাধারণ লোক সব! আরও মজার কথা এই যে, আজ সমস্ত বাহিনী যাদের জয় গানে মত্ত তাদের কেউ কোনদিন সামরিক বিদ্যালয়ের মুখ দেখেনি; কেউ কোনওদিন যুদ্ধও করেনি আগে!

লালবাহিনী গড়ে তোলার গৌরব সবচেয়ে বেশী প্রাপ্য লেনিনের! তাঁরই নেতৃত্বে প্রথম লালফৌজ গড়ে উঠেছিল।

তাঁকে সাহায্য করেন স্টালিন আর ভরোশিলভ! স্টালিন ও যুদ্ধ জানতেন না আর ভরোশিলভও তথৈবচ।

ভরোশিলভ তখন ভল্গা প্রদেশে। চারিদিকে অন্তর্বিপ্লবের আগুন। যে কারখানার মজুরদের মধ্যে ভরোশিলভ বক্তৃতা করছিলেন, বিপ্লববিরোধী বাহিনী সেই গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছিল। মজুররা ভরোশিলভকে বলল নেতা হতে! তিনি তো অবাক! সেনাপতি হবেন কি করে? কুছ পরোয়া নেহি! ভরোশিলভই সেনাপতি হলেন। তারপরে তিনি আর স্টালিন দুজনে মিলে সমস্ত রুশ থেকে বিপ্লববিরোধীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এবারকার যুদ্ধের প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল কয়েকজনের নাম। তখন রোজ খবরের কাগজে বেরোতো ভরোশিলভ, বুদেনি, টিমোশেঙ্কোর নাম! পরে যেন তাদের নাম আর শোনা যেত না! তাঁরা যুদ্ধের পেছনে থেকে সৈন্যদল গড়ে তুলছিলেন। আর সম্মুখে যুদ্ধ করছিলেন জুকভ, রকোসভস্কী, ম্যালিনভস্কী এ সব তরুণ সেনাপতিরা! তরুণদের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ চালনার তাই আজ সব তরুণ সেনাপতিদের নাম শুনবে! যুদ্ধের ভেতরে যত নতুন নতুন সেনাপতি তৈরী হয়েছে লালফৌজের সমস্ত পৃথিবীতে এক যুগে তা হয় কিনা সন্দেহ! পৃথিবীর সমস্ত সামরিক ভাষ্যকার একবাক্যে বলেছেন যে জুকভের মত সামরিক প্রতিভা পৃথিবীতেই বিরল!

কিন্তু সবার ওপরে স্টালিন! লালফৌজের এমন কোনও বড় বিজয়ের নাম করা যাবেনা যাতে স্টালিনের হাত নেই! জার্ম্মানরা যখন মস্কৌ ঘিরে ফেলেছিল তখনো স্টালিন মস্কৌতে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। যখন স্টালিনগ্রাদ যায় যায় তখনো স্টালিন ছিলেন নির্ব্বিকার। চার্চ্চিল নিজেই স্বীকার করেছেন যে স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের তিন মাস আগেই স্টালিন তাঁকে বলেছিলেন যে স্টালিনগ্রাদেই জার্ম্মানদের আটকান হবে। স্টালিন তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের কাহিনীর কাছে পৃথিবীর সব যুদ্ধই হার মেনে যায়! দেড় হাজার জার্ম্মান এরোপ্লেন রোজ বোমায় বিধ্বস্ত করেছিল স্টালিনগ্রাদকে। তবু, তারই ফাঁকে ফাঁকে সৈন্য সংগ্রহ করে স্টালিন প্রতি-আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তাঁর চালবাজী জার্ম্মানরা ধরতে পারে নি। তাঁরা ইন্দুরের কলের মত ধরা পড়েছিল সেখানে।

তারপর এই বার্লিন দখলের কথা নাও! স্টালিন স্বয়ং এর যুদ্ধ চালনা করেছিলেন জুকভের সহায়তায়।

বার্লিনের ওপর সোভিয়েটরা যে কি ভয়াবহ আক্রমণ করেছিল, তার চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়েছিলেন কয়জন বিদেশী সাংবাদিক! লালফৌজ ২৪শে এপ্রিল বার্লিন আক্রমণ করেছিল। ২রা মে জার্ম্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে

বাধ্য হয়! সাত দিনের বেশী নাৎসীরা তাদের রাজধানী রক্ষা করতে পারে নি।

সাংবাদিকরা বার্লিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলেন যে স্টালিনগ্রাদ, স্মলেনস্ক, প্রভৃতি বহু সোভিয়েট নগর তাঁরা দেখেছেন ধ্বংস-পাওয়া অবস্থাতে। কিন্তু বার্লিনের সঙ্গে তার তুলনা চলে না? সাতদিনের যুদ্ধে বার্লিনের যত ক্ষতি হয়েছে, ২০ বছরেও সে ক্ষতি পূরণের আশা নেই! সোভিয়েট কামানের গুলীর দাগা নেই হেন-বাড়ী নেই বার্লিনে! তবে লালফৌজ শুধু ধ্বংসই করে না। তারা গড়েও। তাই এই দুমাসের মধ্যেই তারা বার্লিনের সহজ জীবন যাত্রা চালু করেছে। যা সবাই ভেবেছিল অসাধ্য সেই রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করে তারা ট্রাম চলাবার বন্দোবস্ত করেছে।

দেশ-বিদেশ আর রাশিয়া

রুশ বিপ্লবের পর চৌদ্দটি ধনিক দেশ একযোগে তাকে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে চেয়েছিল একথা সোভিয়েটের লোক ভুলতে পারেনি। আবার ধনিক দেশের সরকারও সোভিয়েট হওয়া অবধি শান্তিতে দিন কাটাতে পারেনি। সব সময়েই তাদের ভয় যে বলশেভিকদের মত যদি তাদের দেশেও বিপ্লব হয়? এসব দেশগুলো তাই চেয়েছিল নিজেদের দেশের লোকের কাছ থেকে সোভিয়েটকে দূরে দূরে রাখতে। সোভিয়েটের লক্ষ্য হল যেন আর কখনো চৌদ্দটি দেশ এক হয়ে তার বিরুদ্ধে না লাগতে পারে তার চেষ্টা করা। ধনিকরা যেমন চেয়েছিল তাকে আলাদা করে রাখতে সে চাইল ওই বাধা ডিঙিয়ে অন্য সবাইর সঙ্গে মিশতে।

গত অন্তর্যুদ্ধ আর বিদেশী আক্রমণ শেষ হয়ে গেলে সোভিয়েট পৃথিবীর সব রাষ্ট্রকেই তার সঙ্গে কুটনীতিক সম্পর্ক রাখতে আহ্বান করেছিল। আর যারা সত্যি সত্যি তার সঙ্গে কাজ কর্ম্ম করতে চাইত সে দেশের

সঙ্গে খুব ভাল ভাবে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা ছিল সোভিয়েটের। কারণ তাহলে ধনিকদের শক্তি অনেক কমে যাবে। ১৯২০ থেকে' ৩০ সালের মধ্যে সোভিয়েট সব চেয়ে ভয় করত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে! তবু ঐ দুই দেশের সঙ্গে সোভিয়েট ব্যবসা-বানিজ্য সম্পর্ক বজায় রেখেছিল প্রথম থেকেই। শুধু তাদের গড়া "লীগ অফ নেশন্স" এ সোভিয়েট তখনো যোগ দিতে সাহস করেনি। ঐ সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানী আর তুরস্কের ভাব ছিল বেশী। জার্ম্মানীতে তখন ছিল গণতান্ত্রিক সরকার, আর তুরস্কে কামালপাশা নতুন করে শাসন সংস্কার করছিলেন। নবীন জার্ম্মানী আর তুরস্ক সহজেই সোভিয়েটের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছিল!

সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীনে জারের আমলে সোভিয়েট অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু সোভিয়েট পরের দেশ দখল করতে চায় না বলে বিপ্লবের পরেই সে সব সুযোগ সরকার ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯২৪ সালে নতুন করে সান্‌ইয়াতসেনের নেতৃত্বে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার মন্ত্রী বিনিময় আরম্ভ হয়। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের বন্ধুত্ব বহুদিন অক্ষুণ্ণ আছে। চীনের জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল দল সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুতা বজায় রাখার বরাবর পক্ষপাতী।

কিন্তু হিটলারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট বুঝতে পারল যে ইউরোপের রাজনীতি আবার জটিল হয়ে উঠছে।

হিটলার প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন যে তিনি সোভিয়েট আক্রমণ করে জার্ম্মানীর সীমা বাড়াবেন। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে যাতে সোভিয়েটের ইউক্রেন তিনি দখল করতে পারেন এজন্য হিটলার উঠে পড়ে লাগলেন। এদিকে সুদূর প্রাচ্যে জাপান একের পর এক দেশ লুঠ করতে আরম্ভ করে দিল। মাঞ্চুরিয়া আর উত্তর-চীন হল জাপানের দাস। সোভিয়েটের তখন দুদিকেই আক্রমণের ভয় হল। জাপান আর জার্ম্মানীও সেই উদ্দেশ্যেই এক হয়ে ইটালিকে নিয়ে কমিনটার্ণ বিরোধী চুক্তি করে।

কমিনটার্ণ হচ্ছে পৃথিবীর যত দেশের কমিউনিস্ট পার্টি আছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে এক বিশ্ব-কমিউনিস্ট পার্টি। তার পুরোনাম হলো 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশান্যাল'। তাকেই সহজ করে বলা হয় "কমিনটার্ণ।"

এ চুক্তির উদ্দেশ্যই হল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই যুদ্ধে নামা।

সোভিয়েট দেখল যে পৃথিবীর রাজনীতিক অবস্থা যেমন তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে তাকেও তেমনি তাড়াতাড়ি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, কামান, সাবমেরিণ তার চাই। কিন্তু এত সব জিনিস তৈরী করতে হলে সময় চাই তার হাতে। তাছাড়া পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী জাতি মিলে এক হয়ে চাপ দিলে তখনো হয়ত যুদ্ধ থামানো যেত!

১৯৩৪ সালে সোভিয়েট জার্ম্মাণীর সঙ্গে আবার বোঝাপড়ার চেষ্টা করিয়াছিল। জেনেভায় সমস্ত শান্তিকামী জাতিরা নিরস্ত্রীকরনের জন্য এক সভা করেছিল। সোভিয়েটের বৈদেশিক মন্ত্রী লিটভিনভ সে প্রস্তাব সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করেছিলেন। এছাড়াও সোভিয়েট সরকার তখন ছোট বড় দশটী দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিলেন। চুক্তির অর্থ হচ্ছে যে যারা সেই চুক্তি করে তাদের কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। ১৯৩৪ সালের পরেও সোভিয়েট জার্ম্মানীর সঙ্গে আর একবার চুক্তির চেষ্টা করেছিল। জার্ম্মানী কোন চুক্তিই করেনি।

১৯৩৪ সালে সোভিয়েট 'লীগ অফ নেশন্স' এ যোগ দেয়। ১৯৩৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সাহায্যের চুক্তি হয় সোভিয়েটের। এর নিয়ম হচ্ছে যে কোন দেশ চুক্তিবদ্ধ দেশের কাউকে আক্রমণ করলে তাকে সাহায্য দেবে। সোভিয়েটের তখন আশা ছিল যে ইংল্যাণ্ড এই সব সন্ধিতে যোগ দিয়ে হিটলারকে থামিয়ে রাখবে। কিন্তু তা সফল হয়নি।

১৯৩৮ সালে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করলেন। তারপর থেকেই শুরু হল তার চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর বিষোদ্গার। চেকোশ্লোভাকিয়াতে একদল জার্ম্মান থাকে। তাদের বলে 'সুদেতেন' জার্ম্মান। হিটলার আন্দোলন আরম্ভ করেন যে চেকরা জার্ম্মানদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে! তাই তিনি

সে সব জার্ম্মানদের বাঁচাতে চান। এদিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি আছে। কাজেই সকলে মনে করল যে বোধহয় যুদ্ধই আরম্ভ হবে তা নিয়ে। সেই সময় ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী চেম্বারলেন আর ফ্রান্সের মন্ত্রী দালাদিয়ের দুজনে মিলে মিউনিকে বসে হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করেন। তাতে তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভাগাভাগি করে জার্ম্মানীর হাতে তুলে দেন। সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও তাঁরা সোভিয়েটকে একবার জিজ্ঞাসাও করেন নি এসম্বন্ধে। অথচ চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করার জন্য সোভিয়েট রীতিমত প্রস্তুত ছিল।

এমনি করে ইউরোপের একের পর এক স্বাধীন দেশ হয়ে ছিল হিটলারের অধীন। মিউনিক চুক্তির পরেই হিটলার প্রায় সমস্ত চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেন। তারপরেই তিনি চাইলেন পোলাণ্ডের ডানজিগ বন্দর দখল করতে। তখন মার্চ্চ ১৯৩৯। লণ্ডন, মস্কৌ, প্যারিস, এ তিন রাজধানীর মধ্যে ঘন ঘন পরামর্শ চলল যে পোলাণ্ডকে কি করে সাহায্য করা যায়। সোভিয়েট প্রস্তাব করল যে পোলাণ্ডকে সাহায্য দিতে তার অমত নেই তবে বাল্‌টিক সীমান্ত থেকে যদি জার্ম্মানী সোভিয়েট আক্রমণ করে তাহলে অন্যদের সাহায্য করতে হবে সোভিয়েটকে। তাছাড়া পোলাণ্ড আক্রান্ত হলে সেই দেশে গিয়ে যাতে লালফৌজ যুদ্ধ করতে পারে সে ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এ প্রস্তাবে

রাজী হল না! পোলাণ্ড লালফৌজকে দেশে ঢুকতে দিতে আপত্তি করল।

সোভিয়েট দেখল যে দু'চার মাসের মধ্যেই যুদ্ধ বাধতে বাধ্য। অথচ ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স হিটলারকেই তোষামোদ করে চলেছে। সোভিয়েটের দিকে তাদের নজর নেই মোটেই, তখন তারা যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তৈরী হল। এমন সময় হিটলার সোভিয়েটের সঙ্গে অনাক্রমণ প্রস্তাব করায় সোভিয়েট তখুনি তাতে রাজী হয়! এই অনাক্রমণ চুক্তি করায় সোভিয়েট ভবিষ্যত যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার পক্ষে আরও সময় পেল।

চারিদিকে তখন যুদ্ধের আশঙ্কা। সোভিয়েটের ভয় ছিল ফিনল্যাণ্ডে, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এসব দেশের কাছে থেকে! ঐ সব দেশগুলো খুব ছোট ছোট। তাদের নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই। তবে জার্ম্মানী বা অন্যদেশ তাদের হাত করে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লাগতে পারে। সবচেয়ে ভয় ছিল ফিনল্যাণ্ডের কাছ থেকে! সোভিয়েটের অন্যতম প্রধান শহর হচ্ছে লেনিনগ্রাদ। তার ২০ মাইলের পরেই ফিনল্যাণ্ড! আর ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে ছিল জার্ম্মানীর চক্রান্ত। ফিনল্যাণ্ড দিয়ে সৈন্য নিয়ে সে সোভিয়েট আক্রমণ করবে। সেই উদ্দেশ্যে ফিনলাণ্ডের সীমান্তে এক সুরক্ষিত দুর্গশ্রেণীও তৈরী করা হয়েছিল। তার নাম 'ম্যানারহাইম লাইন'। এমনি দুর্গশ্রেণী ছিল মাত্র আর দুটি। ফরাসী-জার্ম্মান সীমান্তে

এক ম্যাজিনো আর এক সিগ্‌ফ্রিড লাইন! প্রথমটা ফরাসীদের দ্বিতীয়টা জার্ম্মানদের!

১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডের পতনের পর জার্ম্মানরা সমস্ত পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে চেয়েছিল। রাশিয়া জার্ম্মানীর সে ইচ্ছায় বাধা দেয়। 'সোভিয়েট সৈন্যরা এগিয়ে গিয়ে পোল্যাণ্ডের পূবের অর্দ্ধেক দখল করে সেদেশের গরীবদের মধ্যে জমিদারদের জমিজমা বিলিকরে দেয়। নানা স্কুল খুলে গরীবদের লেখাপড়ারও সুবিধা করে দিয়েছিল। তারপরে বাল্‌টিক অঞ্চলের ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পারষ্পরিক সাহায্যের চুক্তি হয় তার। পরের বছর সাধারণ নির্ব্বাচন হলে এ সব কটি দেশই সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রে যোগ দিয়েছিল।

তখন সোভিয়েট আবার ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করতে চায়। সোভিয়েট যে সমস্ত প্রস্তাব করেছিল জার্ম্মানী ও অন্যান্য দেশের প্ররোচনায় ফিনল্যাণ্ড সেসব প্রস্তাব পরিত্যাগ করে। তখন বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েটকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে। সে যুদ্ধ প্রায় তিন মাস ধরে চলেছিল। তারপর ফিনল্যাণ্ড পরাজিত হয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে সন্ধি করে।

এদিকে জার্ম্মানীও তখন একের পর এক দেশ জয় করছিল ইউরোপে। সোভিয়েটের সঙ্গে জার্ম্মানীর চুক্তিটা আরও পাকাপাকি করার চেষ্টা করে জার্ম্মানরা। কিন্তু

সোভিয়েট আর সে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে রাজী হয় না।

তখন যুগোশ্লোভিয়াতে এক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জার্ম্মানীর বিপক্ষে। সোভিয়েট তার সঙ্গে চুক্তি করেছিল। এদিকে সুদূর প্রাচ্যেও সোভিয়েট জাপানের সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি করেছিল।

অবশেষে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন শেষ রাতে কোনও রকম খবর না দিয়ে গোপনে লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করে। তখন ইংল্যাণ্ড আর সোভিয়েটের সঙ্গে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার জন্য এক চুক্তি হয়! সেই বছরেই জাপান ইংল্যাণ্ড আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আমেরিকাও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইংল্যাণ্ড আর রাশিয়ার দলে যোগ দিয়েছিল।

তখন থেকে প্রায় ৪ বছর ধরে এই নিষ্ঠুর বিশ্বযুদ্ধ চলেছিল জার্ম্মানীর সঙ্গে! অপ্রস্তুত সোভিয়েট দেশ যুদ্ধের প্রথম দিকে হেরে গেলেও—পরে অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে জার্ম্মান সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিল। ২রা মে ১৯৪৫ সালে লালফৌজ বার্লিন দখল করে—আর ৮ই মে জার্ম্মানী মিত্রপক্ষের কাছে করে আত্মসমর্পণ।

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোক সোভিয়েটের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছে নানা ভাবে। ইংরেজ সরকার থেকে অনেক বার

সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসে আলোচনা হয়েছে। বহুদিন ধরে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে নানা কুৎসা প্রচার হয়েছিল তার সমস্ত দূর হয়ে যায় নতুন বন্ধুত্বের ছোঁয়াচে! ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের কাছে সোভিয়েট হচ্ছে মুক্তির প্রতীক! স্টালিন যুদ্ধের প্রথমেই বলেছিলেন যে এযুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের মুক্তি যুদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোক তা সত্যি সত্যি উপলব্ধি করছে।

সোভিয়েট সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ বেড়ে গেছে বহুগুণ। নানা ধরনের সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি সৃষ্টি হয়েছে সে দেশে! তাদের কাজই হল সোভিয়েটের কীর্ত্তি কাহিনী সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের লোককে জানানো!

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকরার সময় আমেরিকা ছিল সোভিয়েটের আর এক সুহৃৎ। প্রায় দেড়শো বছর আগে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার প্রথম সম্পর্ক হয়েছিল "ফার" কেনা বেচা নিয়ে! তারপরে জারের এক প্রতিনিধি কালিফোর্নিয়ার গভর্ণরের মেয়েকে বিয়ে করে নিজের দেশের জন্য কতগুলো সুবিধা আদায় করেছিল আলাস্কায়। কিন্তু তারপরেই তিনি উধাও হলেন আর ফিরলেন না। রাজকুমারী বৃথাই দিন গুনছিলেন তার ফিরে আসার।

এরপরে সান্-ফ্রান্সিস্কোর প্রায় নব্বই মাইল উত্তরে রাশিয়ানরা এক উপনিবেশ তৈরী করেছিল। জার ও-গুলোকে নিজের রাজ্যের অন্তর্গত বলে মনে করতেন। সেই

সব কারণেই আমেরিকা মনরো নীতি প্রচার করে ইউরোপের রাজরাজড়াকে আমেরিকায় হাত দিতে সাবধান করে দেয়।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষ হলে জার সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন নি। বহুদিন পরে আবার নতুন করে রাশিয়ায় আর আমেরিকায় সৌহৃদ্য গড়ে ওঠে! রাশিয়া আলাস্কা প্রদেশ দিয়ে দেয় আমেরিকাকে। আমেরিকাও সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্য করে রাশিয়াকে!

কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের সময় আমেরিকা রাশিয়াকে চিনতে পারেনি ঠিক করে। তারা ত যোগ দিয়েছিল বলশেভিকদের বিপক্ষে! তারপর ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকা সোভিয়েটকে স্বীকার করে নি। তবে তারই মধ্যে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার সোভিয়েটে গিয়ে তাদের বহু কর্ম্ম শিখিয়েছে। ১৯৩৩ সালে ফ্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রথমে সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করে নেন। তারপর থেকে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েটের বন্ধুত্ব বজায় আছে।

জাপানযুদ্ধের ভেতর দিয়ে সে হয়েছে আরও পাকা! সোভিয়েটও যেমন সাহায্য পেয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে আমেরিকাও তেমনি সোভিয়েটের বীরত্বের কাছে ঋণী! আমেরিকার সবাই একবাক্যে বলেছে :

"রাশিয়া আমাদের জন্য যা করেছে তা আর কে করতে পারত, তারা প্রায় তিন শত ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করছিল বলেই আমরা জাপানের সঙ্গে লড়বার সুযোগ পেয়েছি।

মস্কৌ, লেনিনগ্রাদ, স্টালিনগ্রাদ, তারা যখন জার্ম্মানীর হাত থেকে বাঁচিয়েছে সেই সঙ্গে তারা বাঁচিয়েছে নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনকে !”

রাশিয়াকে বাদ দিয়ে কি ইংল্যাণ্ড কি আমেরিকা তাদের নিজেদের কথা আজ আর ভাবতে পারে না।

মস্কৌয়ে একদিন

আমাদের দেশের অনেকেই সোভিয়েটে গিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে তোমরা অনেক গল্প শুনে থাকতে পারো। আর বাঙালীও তো অনেকে আছেন সেখানে। যাদের বাড়ীতে রেডিয়ো আছে তারা মস্কৌ ধরতে পারলে মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় খবর শুনতে পাবে।

মস্কৌ স্টেশনে নেমেই কুলী কুলী করে চেঁচিয়োনা কিন্তু! কুলী পাবেনা সেখানে। তোমার নিজের মোট নিজেকেই বইতে হবে। তবে যদি হঠাৎ কোন কমশোমল কিংবা অন্য কেউ দয়া করে তোমার দুরবস্থা দেখে সাহায্য করে তো সে ভিন্ন কথা।

সোভিয়েটে নামবা মাত্রই তোমার নাম ধাম ঠিকানা, উদ্দেশ্য সব কিছু সরকার থেকে জেনে·নেবে। একদেশ থেকে আর একদেশে যেতে হলে পাসপোর্ট দরকার হয়। সোভিয়েটে ঢুকলেই তোমার পাসপোর্ট সরকারী জিম্মায় রাখা হবে। আবার যেদিন সোভিয়েট ছেড়ে যাবে সেদিন ফেরৎ পাবে সে

পাসপোর্ট তারজন্য হাঙ্গামাও করতে হবে তোমাকে অনেক —বিশেষ করে যুদ্ধের মধ্যে। তারজন্যে তোমার চারটে ফটো পাঠাতে হবে "ইনটুরিস্ট এ।" ইনটুরিস্ট এর কাজই হচ্ছে বিদেশীদের তত্ত্বাবধান করা! ইনটুরিস্টদের নিজেদেরই হোটেল-টোটেল সব বন্দোবস্ত আছে পাকাপাকি!

মস্কৌয়ে থাকলে তুমি উঠবে তাদের ন্যাশন্যাল কি মেট্রোপলি হোটেলে! খরচ নিতান্ত মন্দ নয়। সেখানে বেশ সাজানো গোছানো বড় ঘর পাবে থাকবার, পাশেই বাথরুম। চমৎকার ইংরাজী জানা সুন্দর সুন্দর মেয়েরা তোমাদের দেখাশুনা করবে।

মনে কর বেশ ভারিক্কী চালে তুমি থাকতে চাও! মোটর নিয়ে জাঁকিয়ে থাকবে। ইনটুরিস্ট এর কাছে তোমায় দরখাস্ত করতে হবে মোটরের জন্য! সেখানের ড্রাইভার এদেশের মত সারাদিন গাড়ীতে বসে থাকবে না। তাদের খাটুনীর নিয়ম আছে বাঁধা। অন্ততঃ একদিন আগে তোমার কাজের ফিরিস্তি দিয়ে উপরওয়ালাদের জানিয়ে দিতে হবে—তবে পাবে ড্রাইভার! এদেশে সবাই কাজের ফিরিস্তি নিয়ে রাখে ডায়েরী। তোমাকেও তাই করতে হবে। ভোরে উঠে কাজের ফিরিস্তি দেখে তোমার সেক্রেটারীকে টেলিফোন করবে গাড়ীর জন্য! হ্যাঁ সেখানে তোমার সেক্রেটারী রাখতে হবে বইকি! তা না হলে কে তোমায় ওদেশের ভাষা বুঝিয়ে দেবে? ঘণ্টায় দেবে ২৪ রুবল ট্যাক্সি ভাড়া।

আচ্ছা সবাই তো আর মোটর হাঁকিয়ে চলতে পারে না? তারা কি করে? তারা চড়বে ট্রামে আর ট্রলি বাসে। সে সব গাড়িতে ভিড় আমাদের কলকাতার মতই। এ বিষয়ে মস্কৌর লোকরা হিংসে করে ইংরাজদের। ইংরাজরা নাকি খুব নিয়মানুবর্ত্তী। অযথা হট্টগোল ভিড় জমায় না গাড়িতে! গাড়ির ভীড় কমানোর জন্য আছে মাটির নিচের রাস্তা; তাকে মস্কৌয় বলে মেট্রো! মস্কৌর মেট্রো একটা দেখবার মত জিনিস। সেখানে লোকজন বেড়াতে যায় অনেকে।

রাস্তায় বেরিয়েই পড়বে ভাষার গোলমালে। সেজন্যে কতগুলো রাশিয়ান শব্দ আগে থেকে শিখে নিতে পারলে মন্দ হয় না! প্রথমেই শিখবে সেচাস (Seychass) মানে কালকে; হারাশো (Harasho) হচ্ছে বেশ-অল্‌রাইট; আর নিশেভো (Nichevo) বলবে যখন কোন কথা খুঁজে পাবে না শুধু ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে অমত জানাতে হবে। নিয়েট (Niet) হচ্ছে-না; দা (Da) বলবে হ্যাঁ কে। স্টো (Shto) মানে কি; আসতে পারি কি বোঝাতে বলবে মোইনা (Moyna)।

সেক্রেটারী একবার টেলিফোনে কথা শুরু করলেই হল আর কি—তোমার কান ঝালাপালা হয়ে যাবে দা দা স্টো স্টো শুনতে শুনতে।

এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি! একজন বাঙালী সাংবাদিক বলেছেন যে রাশিয়ান আর সংস্কৃত ভাষার ভীষণ

মিল আছে! সংস্কৃত জানলে রাশিয়ান শেখা নাকি খুব সহজ। তোমরা চেষ্টা করে দেখবে কি?

সব হোটেলে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলে। তবে প্রত্যেক আট ঘণ্টা অন্তর লোক বদল হয় বলে তোমার প্রত্যেক কাজই তিনবার তিনজনকে ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। তা না হলে তোমার কোন কাজই হবে না।

সকাল ৯টার সময় আসবে চা জলখাবার। তখন তোমায় তৈরী থাকতে হবে ফিটফাট হয়ে। যুদ্ধের মধ্যে অবশ্য মনের মত খাবার কোথায়ই বা পাবে! তবু একেবারে ফেলনা হবে না কিছু! অমন মাখন তুমি পাবে কোথায়? আমাদের দেশে এগুলো র‍্যাশন হয় নি। বিলেতে হয়েছে। বিলেতের সারা সপ্তাহের মাখন এরা দেবে তোমায় এক বেলাতেই। মাখন হয় রাশিয়ায় যথেষ্ট, তারা মাখন দিয়েই করে সব রান্নাবান্না! তাই মাখনের অপচয় দেখে বিদেশীদের গা কস্ কস্ করে। কেক্, বিস্কুট, রুটি, আইসক্রীম কিছুরই অভাব নেই। আইসক্রীম খেতে ওরা খুব ভালবাসে। এত শীতের দেশতো ওদের তবু দেখবে শীতের সময়েও আইসক্রীমের দোকানে লম্বা কিউ। মস্কোর লাল স্কোয়ারে আছে এক খোলা কাফে! তাতে কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম ঝড় ঝঞ্ঝা যাই হক না কেন আইসক্রীম খাবার লোকের অভাব হয় না।

চা খায় এদেশের লোক সব সময়েই। এতই চা খোর তারা যে ছোট কাপের চেয়ে বাটী ভরে খাওয়াই বেশী পছন্দ

করে সবাই। তোমাদের কিন্তু তেমন ভাল লাগবে না সে চা। তাতে দুধ থাকবে না। দুধের বদলে দেওয়া হয় লেবুর রস আর চিনির বদলে অনেকে জ্যাম দিয়েও চা খায়।

চা খেয়ে বের হলে মস্কৌ ঘুরতে। ক্রেমলিন দেখবে নিশ্চয়ই! লালস্কোয়ার দেখতেও ভুলো না। সেখানে দেখবে এক পাশে আছে লেনিনের সমাধি! তাতে প্রত্যেক বছর লেনিনের মৃত্যুর দিন লক্ষ লক্ষ লোক ফুল উপহার দিয়ে যায়।

"প্রাভদা" সংবাদ পত্রের আফিসেও যাবে। তাছাড়া লাইব্রেরী মিউজিয়াম তো দেখবেই। এমনি করে দুপুর হলে আবার ফিরে এলে হোটেলে! এবার দুপুরের ভোজ। হোটেলের বিদেশীদের জন্য খাবার র‍্যাশনের বালাই নেই! সসেজ, পনীর, চমৎকার স্যালাড জমা করা থাকে টেবিলে। ওগুলো প্রধান খাবার নয় এই টুকিটাকি আর কি! ওসব নাড়া-চাড়া করবার পর তোমায় দেবে সুপ! সুপ না হলে রাশিয়ানদের পেটই ভরবে না। সব চেয়ে নাম করা রাশিয়ান সুপ হচ্ছে "বরশ্" (Borshch)! হরেক রকমের তরকারী থাকে এতে। তার সঙ্গে বিট দেওয়া থাকে বলে রং হয় রক্তের মত লাল টুকটুকে। পাতে দেবার সময় তাতে দেওয়া হয় একতাল টক 'সর'। "বরশ" ছাড়া আছে "স্কী" (Schee)— বাধাকপি থাকে বলে এর রঙ হয় ফিকে সবুজ—তাতে আবার বিয়ার দেয় মিশিয়ে! সুপের সঙ্গে মটর শুঁটি চিবিয়ে খাবার রেওয়াজ আছে সে দেশে।

সোভিয়েটের খাবার নিয়ে ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব এ্যাণ্টনী ইডেন সম্পর্কে মজার গল্প আছে। তিনি মস্কৌ এলে তাঁকে বেশ রাজসিক ভাবে খাবার দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। টুকিটাকী খাবারগুলোকে রাশিয়ান ভাষায় বলে "ঝাকুস্কী" (Zakuski)। ঝাকুস্কী আর রক্তিম বোর্শ্ খেয়েই তো তাঁর পেট ঢাক! তিনি পাশের একজন মহিলাকে বললেন রাশিয়ার লোকে খাবার শেষে স্যুপ খায় এ কেমন ব্যাপার? কিন্তু একটু পরেই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। কারণ স্যুপ তো ছিল তাদের খাবারের আরম্ভ মাত্র!

মাছ আর মাংসের ছড়াছড়ি রাশিয়ায়। মাছ দিয়ে তারা খুব চমৎকার ঠাণ্ডা স্যালাড তৈরী করতে পারে।

ভদ্কা হচ্ছে সোভিয়েটের খুব নাম করা মদ। গল্পে উপন্যাসে অনেকেই নিশ্চয় এর নাম শুনেছো। কিন্তু আজকাল মস্কৌর কোন তরুণ কমিউনিস্টকে আর ভদ্কা খেতে দেখতে পাবে না তুমি। রুশ তরুণরা ভদ্কা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

বেশ পেট ভরে খেয়ে নিয়ে যদি একবার বাজারে বেরোও জামা কাপড় কেনবার জন্যে তো মন্দ হয় না কি বল?

তবে সোমবারে বাজার করতে বেরিয়ো না। ঐদিন প্রায়ই সব দোকান থাকে বন্ধ। রবিবার দিনই সবাই বাজার করতে বেরোয়! দশটায় খোলে সব দোকান

আর বন্ধ হয় সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায়। মস্কৌর সব চেয়ে বড় দোকান হল মোস্টোর্গ (Mostorg)। সেখানে গিয়ে তুমি দাম জিজ্ঞেস করলে গরম জামার। বেশ এক গাদা নোট পকেটে না নিয়ে যেওনা যেন সেখানে। একটা কোটের দামই হবে কমপক্ষে সাড়ে তিনশো টাকা!

মোস্টোর্গ এ কিছুক্ষণ যদি দাঁড়াও তো দেখবে কত লোক কিনছে সেণ্ট আর এসেন্স! মেয়ে পুরুষ অনেকেই রঙ মাখে নখে! এসেন্সের ঘরের পরেই ভীড় জমে বেশী ফটো আর গ্রামোফোন বিভাগে।

নতুন ছাড়াও পুরোনো জিনিসের বাজার আছে সেই মস্কৌয়! ইচ্ছে করলে সেটাও ঘুরে দেখতে পারো।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হব হব হবে নিশ্চয়ই। সন্ধ্যেয় বায়স্কোপ দেখতে মন উস্‌খুস্‌ করে, না? চটকরে ঢুকে পড়ো কোন থিয়েটার কি সিনেমায়। তারপর রাত্রে হোটেলে ফিরে খাবার খেয়ে আরামে ঘুমোও।

সোভিয়েট সাহিত্য ও সংবাদপত্র

যুগ যুগ ধরে রুশীয় সাহিত্যিকরা যে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তার তুলনা মেলা ভার। পুশকিন, গোগোল, ডস্টয়েভস্কী, টলস্টয়, লেরমণ্টভ চেকভ, টুর্গেনিভ এঁরা বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদেরই কয়েকজন।

মানুষের জীবনের কথা নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ কি ভাবে, তার দুঃখ কষ্ট, সমাজের মধ্যে তার কি স্থান এ সবই হ'ল সাহিত্যের বিষয়বস্তু। ন্যায়পরায়ণতা আর আদর্শের মহত্ত্বই হল মানুষের গর্ব্বের জিনিস। রুশীয় লেখকরা আদি যুগ থেকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এ দুটি আদর্শ অনুসরণ করতেন। তাই সমাজে ছিল তাঁদের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। সমাজের বুকে যখন গরীবের ওপর বড়লোকের অত্যাচার আর অনাচারের স্রোত বয়ে গেছে, কোন দিকে আশার আলো দেখা যায় নি তখন অন্য পাঁচজনের যত দুঃখ সব তাঁরা নিজেরাও ভোগ করতেন। দেশের

স্বাধীনতা আর অত্যাচারিতের মুক্তির কথা তাঁরা মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলেন নি।

আলেকজান্দার পুশকিন হচ্ছেন রুশ সাহিত্যের প্রধান স্রষ্টা। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর তিনি রচনা আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও নাট্যকার। তাঁর লেখা গল্পও আছে অনেক। রুশ জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন অতি আদরের। দুর্ভাগ্যবশতঃ আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। সেকালে ইওরোপে কারুর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হলে দুজন দুজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতেন। তখন তাদের দুজনেই হয় তলোয়ায় নয়ত পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ করতেন।

পুশকিনের মত আর একজন বিখ্যাত লেখকও মাত্র আটাশ বছর বয়সে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল লেরমণ্টভ।

গোগোল হচ্ছেন আর একজন বিখ্যাত লেখক। 'গভর্ণমেণ্ট ইনস্‌পেক্টর' নামে তাঁর এক চমৎকার নাটক আছে। এর বাংলা করেছেন শ্রীযুক্ত অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী। তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে তখনকার সমাজের যত দোষ ক্রুটি।

গোগোলের চেয়ে আমাদের দেশে টুর্গেনিভ বেশী পরিচিত। তিনি লিখতেন রুশ নিহিলিস্টদের জীবন সম্বন্ধে। বাংলায় যাঁদের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে

যোগাযোগ আছে তাঁদের প্রায় সবাই টুর্গেনিভের লেখা পড়েছেন।

তবে এঁদের চেয়েও বিখ্যাত হচ্ছেন লিও টলস্টয়। এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। গরীব দুঃখী অত্যাচারিত চাষীরাও তাঁর উপন্যাসে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর অনেক বইএর বাংলা তর্জ্জমা হয়েছে। এ্যানা ক্যারেনিনা, রেসারেকশন—আরও অনেক বই।

নিপীড়িত মজুরদের নিয়ে ডস্টয়েভস্কী অনেক উপন্যাস লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে দুঃখী মজুররাও অনেক সময় মনুষ্যত্বের বিচারে উঁচুতে স্থান পাবার যোগ্য। 'অপরাধ ও শাস্তি' নামে তাঁর বইটি সব চেয়ে বিখ্যাত। এঁরা ছাড়া চেকভ লিখেছেন গত শতাব্দীর শেষের দিকে।

এঁদের শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে একদল সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়েছিল রাশিয়াতে। তাঁদের চোখের সামনে ঘটেছিল রুশ বিপ্লব। জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার চাষী-মজুর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তখন সাহিত্যে এল নব যুগ। এযুগে সবাইর আগে নাম করতে হয় গর্কীর। নিজে গরীব ছিলেন বলে তিনি মজুরদের দুঃখ কষ্ট খুব ভাল করে বুঝতেন। সে জন্যে তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন।

গোর্কীর বহু বইএর বাংলা অনুবাদ হয়েছে। সেগুলো



ম্যাক্সিম গর্কী—সোভিয়েটের সেরা লেখক



জাম্বুল—কাজাকস্থানের চারণ কবি।



পুশকিন—রাশিয়ার প্রাচীন মহাকবি

পড়লেই বুঝতে পারবে কেন তাঁকে সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলা হয়। তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন তিনি তিনটী খণ্ডে। তার মধ্যে শৈশব, আমার শিক্ষাকেন্দ্র, আর তাঁর ডায়েরীর বাংলায় অনুবাদ করেছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। মজুরদের গোপন আন্দোলন নিয়ে লেখা বই 'মা'র বাংলা করেছেন বিমল সেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা করেছেন 'একদিন যারা মানুষ ছিল' বইটির।

আলেক্সী টলস্টয় ছিলেন আর একজন খুব শক্তিশালী লেখক। তার লেখা বই 'রোড টু ক্যালভেরী' তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ। অশোক গুহ তার বাংলা করেছেন 'তমশার শেষে' নাম দিয়ে।

মাইকেল শোলোকোভও এদেশের পাঠকদের কাছে খুব পরিচিত। তাঁরও দুটি বিখ্যাত বইয়ের বাংলা করেছেন সুধীন্দ্রনাথ সরকার। 'একটি ডননদীর গতিপথে' আর অন্যটি 'সাগর সঙ্গমে ডন নদী।'

ফিওডোর প্যানফেরভও বর্ত্তমান যুগের খুব নাম করা লেখক। তাঁর স্টালিন পুরস্কার পাওয়া বই 'এ্যাণ্ড দেন দি হারভেষ্ট'এর বাংলা তর্জ্জমা হয়েছে 'সফল স্বপ্ন' নাম দিয়ে।

কবিদের মধ্যে নাম করা হচ্ছেন মায়াকোভস্কী। রবীন্দ্রনাথের মতই তাঁর প্রভাব সোভিয়েট কবিদের উপর।

এসব তো গেল বড়দের সাহিত্যের কথা। আমাদের মত কিশোরদের কেউ ভুলে থাকে না সে দেশে। ছোটদের

জন্যও যে কত বই লেখা হয় তার খবর কে রাখে। সে সব কাহিনী পড়ে ছোটরা তাদের চারপাশের সোভিয়েট জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়। নিজেরা সব জিনিস ভাল করে ভাবতে শেখে। কিশোরদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী নাম করা লেখক হচ্ছেন সামুয়েল মার্শাক। আর একজন হচ্চেন মিখাইল ইলিন। তাঁর 'হাউ ম্যান বিকেম এ জায়াণ্ট' বইটির সংক্ষিপ্ত বাংলা হয়েছে 'মানুষ কি করে বড় হল' নামে।

ছোটদের বই ছাপাবার বন্দোবস্তই আছে আলাদা। সে প্রকাশালয়ের নাম হচ্ছে 'দেতজিগ' শিশু প্রকাশালয়।

সোভিয়েটের লেখক শুধু নিজেদের লেখা নিয়েই মেতে থাকেন না। দেশ বিদেশের মনীষীদের লেখার অনুবাদ করেন তাঁরা নিজেদের ভাষায়! তোমাদের শুনলে গর্ব্ব হবে যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের অনেক বই রুশ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

বর্ত্তমান সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ কবি টিখনভ বলেন, "রবীন্দ্রনাথের নাম মনে হলে কল্পনায় ভেসে ওঠে এক বিরাট দেশ আর সভ্যতার ছবি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দিগন্ত প্রসারী প্রান্তর আর প্রাচীন নগরের মেলা দেখতে পাই আমরা রবীন্দ্রনাথের আড়ালে। রাশিয়ার তুষারের ভেতরে বসে বিপ্লবের বজ্র বিদ্যুতের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে শুনেছি তাঁর বাণী! কবিতা, উপন্যাস, নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতের মর্ম্মবাণী!" তাঁর

গীতাঞ্জলি, গোরা, জীবনস্মৃতির অনুবাদ হয়েছে কুড়ি হাজার করে।

আমাদের দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও তাঁরা অনেক কিছু জানতে চান। রামায়ণ মহাভারতও তাঁরা অনুবাদ করেছেন।

এতক্ষণ শুনলে তো শুধু সাহিত্যের কথা। কিন্তু সাহিত্যের বাহক হচ্ছে সংবাদপত্র। সোভিয়েটের খবরের কাগজের কাজ হল লেখাপড়ায় সাহায্য করা। কাগজ পড়ে দেশের লোক জানতে পারে তার চারপাশে নতুন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ কি করে গড়ে উঠছে। সোভিয়েটের খবরের কাগজ এজন্যে বাইরের অনেকে পছন্দ করে না। বাইরের লোকের কাছে নীরস লাগলেও সোভিয়েটের লোকেরা সে সব কাগজ পড়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে। তুমি যদি দেশের কোন কাজ কর তো ঠিক জেনো যে কাগজে তোমার ছবি বেরোবেই। লাইন করে লোক খবরের কাগজ কেনে। ফসল কাটার সময় গ্রামের লোক মাঠে জমায়েত হয়ে কাগজ পড়ে।

আজ সারা সোভিয়েটে নয় হাজার খবরের কাগজ বেরোয়; জারের আমলে বেরোত মাত্র ৮৫০টা। একশো কুড়িটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ছাপা হয় এ সব কাগজ। সোভিয়েটের যত ভাষা আছে তার প্রত্যেকটিতেই কাগজ ছাপা হয়। তা না হলে লোক পড়বে কি করে?

সোভিয়েটের সবচেয়ে বিখ্যাত কাগজ হচ্ছে প্রাভদা। ওখানকার কমিউনিস্টদলের মুখপত্ররূপে ওটী ছাপা হয়। এ কাগজ বিক্রি হয় কুড়ি লক্ষেরও বেশী। ছোটদের জন্য আছে "পাইওনীয়ারদের প্রাভদা।" তার বিক্রি হল নয় লক্ষ। যে সব বুড়োরা বিপ্লবের পরে নতুন লেখাপড়া শিখছে তাদের জন্য বড় বড় হরফে আলাদা কাগজ ছাপা হয়।

এসব ছাপানো কাগজ বাদ দিলে থাকে লক্ষ লক্ষ হাতে লেখা প্রাচীরপত্র। স্কুল, কলেজ, সব জায়গাতেই এ সব কাগজ আছে।



ইলিয়া এরেনবুর্গ



মিখাইল সোলোকোভ—কশাকদের জীবন নীয়ে লিখতে এঁর জুড়ি নেই কেউ।

আমরা আর সোভিয়েট

আজ পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যার সাধারণ লোক থেকে আরম্ভ করে মনীষীরা পর্য্যন্ত সোভিয়েটের বিস্ময়কর সাফল্য দেখে অনুপ্রাণিত না হয়েছেন।

১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করেছিলেন। তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতেও সোভিয়েটের প্রশংসা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। তাতে আছেঃ "মানুষের উন্নতির পথে সাহায্য করে এমন সব সামাজিক ও সংস্কৃতিগত জিনিস বাঁচাবার জন্য সোভিয়েট প্রাণপণ লড়ছে। যুদ্ধের তাণ্ডবে আজ যদি সেই প্রচেষ্টা নষ্ট হতে বসে তো তা হবে সভ্যতার পক্ষে ভীষণ দুর্য্যোগ।"

তখন হিটলারী যুদ্ধের রথ ধেয়ে চলেছিল রাশিয়ার বুকের ওপর দিয়ে ককেশাসের দিকে। উদ্দেশ্য ছিল ককেশাস পেরিয়ে ভারতে এসে জাপানের সঙ্গে হাত মেলাবার। ভারতের অতুল ধনসম্পদের ওপর জার্ম্মানীর লোভ বহুদিনের।

কিন্তু সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সভাপতি বলেছিলেন, "নাৎসী-দের কবর খোঁড়া হবে ককেশাসে। ভারতে তাদের যেতে দেব না!"

সোভিয়েট সৈন্যের অসীম বীরত্বে ভারত বেঁচেছিল ফ্যাসিস্ট দুঃশাসনের হাত থেকে। সোভিয়েটের বীরত্ব আর প্রেরণাকে ভারতের সকলে একবাক্যে অভিনন্দিত করেছিল তখন।

"হিন্দুস্থান" হচ্ছে সংযুক্তপ্রদেশের নাম করা সাপ্তাহিক কাগজ। তাতে সম্পাদক লিখেছিলেন "সোভিয়েটকে নমস্কার। যে দুর্ব্বার নাৎসী দল গিয়েছিল সোভিয়েটের শান্তির রাজ্য ধ্বংস করতে তাদের যে অপূর্ব্ব বাধা তারা দিয়েছে সে জন্য লালফৌজকে ধন্যবাদ! নিজেদের স্বাধীনতার জন্য তারা যে সংগ্রাম করছে একপক্ষে তা আমাদেরই যুদ্ধ! ফ্যাসিস্টরা চায় সমস্ত পৃথিবীকে পরাধীন করতে। তাদের হাত থেকে মুক্তি দিচ্ছে সোভিয়েট পৃথিবীর সবাইকে—পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, ফিনল্যাণ্ড!

"যারা অন্যদেশকে পরাধীন রাখতে চায় সেই সাম্রাজ্য-বাদীদের অপপ্রচারে যেন আমরা মোটেই বিশ্বাস না করি। এমন কি আমাদের সহজাত বৃটিশ বিরোধিতার জন্যেও যেন আমরা এমন কিছু না করি যাতে সোভিয়েটের অসুবিধা হতে পারে।"

অমৃতবাজার পত্রিকার কথা তোমরা সবাই জানো। তাতে লেখা হয়েছিল :

"তিন বছরের অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধের পরে আজ বিরাটকায় সোভিয়েট ইওরোপের বুক জুড়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েটের বাইরের খুব কম লোকই ভাবতে পেরেছিল যে নাৎসীদের হারাবার মত অলৌকিক কাজ কখনো সম্ভব হতে পারে।

"কিছুদিন আগেও বহুদেশের লোকই বলশেভিকবাদকে বর্ব্বরতারই সামিল মনে করত। আজ প্রমাণিত হয়েছে যে তা ছিল কত মিথ্যা। এখন পর্য্যন্ত সোভিয়েটের রাজ্য সংগঠনের তুলনা দেবার মত কিছু সৃষ্টি হয় নি কোনদেশে। এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ!"

ভারতের মহীয়সী মহিলা হচ্ছেন সরোজিনী নাইডু। সোভিয়েটের আদর্শ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ

"পৃথিবীতে আজ এমন শিশু, তরুণ কি বৃদ্ধ কে আছে যার মন সোভিয়েটের এই অমানুষিক শৌর্য্য, সহনশীলতা আর যুদ্ধের ক্ষমতা দেখে আনন্দে না নেচে উঠে?

"গত পঁচিশ বছরে তারা যা করেছে তা যেন আমাদের কাছে শোনায় রূপকথার মত।"

তোমাদের অনেকেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়েছো। ১৯৩০ সালে সোভিয়েট থেকে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তাই নিয়ে হচ্ছে "রাশিয়ার চিঠি।"

মস্কৌর লেখক সম্মিলনে তিনি এই বাণী দিয়েছিলেন,

"আমার চিরজীবনের সাধনা, আমার স্বপ্ন ছিল মুক্ত মানুষ গড়ে কাজের ভেতর জড়িয়ে রাখবো তাকে। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের আত্মা আছে খাঁচায় বন্দী হয়ে। তোমাদের দেশে তোমরা নির্ম্মূল করেছ এ আপদকে।

"তোমরা মানুষকে শুধু বিজ্ঞান শিক্ষাই দিচ্ছ না—তাকে করে তুলছে সত্যিকারের স্রষ্টা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের আত্মা মুক্তির সুযোগ পাচ্ছে! আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও!"

মৃত্যু শয্যাতেও তিনি সোভিয়েটকে ভুলতে পারেন নি! মৃত্যুর বোধ হয় আধ ঘণ্টা মাত্র আগে তিনি অধ্যাপক প্রশান্ত মহালানবীশের সঙ্গে কথা বলছিলেন সোভিয়েটের যুদ্ধের খবর নিয়ে। গুরুদেব জিজ্ঞেস করেন সে দিনের যুদ্ধের খবর। শ্রীযুক্তমহালানবিশ উত্তর দেন,

"যুদ্ধের খবর ভাল—সোভিয়েটের বাধা বোধ হয় ফলপ্রসূ হচ্ছে।"

"কেন হবে না" গুরুদেব উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন "তারা জিতবেই জিতবে, আর তারাই করবে অসাধ্য সাধন।"

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হচ্ছেন ডাঃ এইচ, জে, ভাবা। ভারতের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে কনিষ্ঠ এফ, আর, এস!

সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনিও বলেছিলেন ঃ

এ যুদ্ধে সোভিয়েটকে যত দুঃখ, দুর্দ্দশা সহ্য করতে হল তার তুলনা নেই ইতিহাসে। আমেরিকার কাগজ 'লাইফ'এর মতে আমেরিকা কি বৃটেন জানেই না কি ভীষণ সংগ্রাম চলেছে রাশিয়ার বুকে। প্রায় ১ কোটি সাধারণ নাগরিককে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে এ যুদ্ধে, আরও প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিক হয়েছে বন্দী। এ যুদ্ধের ধারণাই করতে পারব না আমরা। সেই ভয়াবহ যুদ্ধের হাত থেকে যে ভারতবর্ষ রেহাই পেয়েছে তার একমাত্র গৌরব লালফৌজের প্রাপ্য! এ ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না!...তবে আমরা সোভিয়েট ব্যবস্থা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।"

দার্শনিক শ্রেষ্ঠ সার রাধাকৃষ্ণণও সোভিয়েটের অপূর্ব্ব শৌর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন "ইওরোপের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ও গণতন্ত্রের আদর্শের জন্য সোভিয়েটের অপূর্ব্ব সাফল্য আমাদের স্বভাবতই আকৃষ্ট করে।"

সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ-এর মত পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানীও বলতে বাধ্য হয়েছেন—"এ অলৌকিক সাফল্যে আমাদেরও নিজের শক্তিতে বিশ্বাস আনা উচিৎ যে ভারতেও এরকম অসাধ্য সাধিত হতে পারে!"

ভারতে যারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন তাদের সবাই সোভিয়েট আদর্শে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন!

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ১৯২৮ সালে, "বলশেভিক আদর্শের

পেছনে আছে অগণ্য নর-নারীর অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ। যে আদর্শ লেনিনের মত বিরাট পুরুষের পূতঃ স্পর্শে ধন্য তা কখনই বৃথা হতে পারে না।”

তরুণ ভারতের অবিসম্বাদী নেতা হচ্ছেন জওহরলাল নেহেরু! লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন, “সোস্যালিজম ভিন্ন আমি এই অগণিত দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত ভারতবাসীর মুক্তির উপায় জানি না। বর্ত্তমান ধনতন্ত্রী সভ্যতা থেকে এ হল সম্পূর্ণ আলাদা। এর কিছুটা আভাস আমরা পাই সোভিয়েট থেকে। ...আজ যদি মানুষের ভবিষ্যতে আশার ক্ষীণ রশ্মিও দেখা যায় তো তার গৌরব হবে সোভিয়েটের প্রাপ্য!...”

তিনি নিজেই সেদেশে গিয়েছিলেন ১৯২৯ সালে।

ভারতের মুস্লিম লীগের সেক্রেটারী নবাবজাদা লিয়াকত আলি খাঁ'ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সোভিয়েটকে! কাশ্মীরের একচ্ছত্র নেতা সেখ আব্দুল্লার প্রধান কামনা হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ আর সোভিয়েটের ভেতর প্রীতির বন্ধন হয় আরো দৃঢ়তর!

ভারতের সব নেতাই এমনি করে সোভিয়েটের আদর্শে প্রেরণা লাভ করেছেন বলেই আজ তোমাদেরও কর্ত্তব্য এই বিরাট দেশের সব খবরাখবর জানা! ইংল্যাণ্ডের মনীষী বিয়াত্রিস্ ওয়েব বলেছেন সোভিয়েট সাম্যবাদ হচ্ছে এক নতুন সভ্যতা।

পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে সোভিয়েট। কাজেই আমাদের দিকেও তারা বন্ধুর মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের গণ-নাট্য সঙ্ঘ হচ্ছে সাধারণের আশা আকাঙ্খা নিয়ে নাট্যরূপ দেবার সমিতি। এদের অভ্যর্থনা করে মস্কোর শ্রেষ্ঠ নট-নটী এক অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। ভারতের নাটক, জীবন ধারণের প্রণালী, ও নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন!

সোভিয়েট ও ভারতের মধ্যে যাতে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হতে পারে তার জন্যে আছে এদেশে "ভারতীয় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি।"

পরাধীন দেশ আমাদের। মুক্তির ধ্বজাধারী সোভিয়েটকেই করতে হবে আমাদের আদর্শ! নিজের দেশকে জানতে হবে ভালকরে আর সোভিয়েটের সঙ্গে তুলনা করে এগোতে হবে স্বাধীনতার পথে। বহু জাতির দেশ সোভিয়েট। ভারতও তাই। সোভিয়েটের জাতি সমস্যা কি করে সমাধান করা হল, ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কি করে তারা দূর করল, এ সবই শিখতে হবে তোমাদের।

কিন্তু ভুলো না যেন অন্ধ অনুকরণ করা আত্মহত্যারই সামিল! জেনে শুনে বুঝে তবে এগোতে হবে তোমাদের!
